শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

৭৮।২ নং, হ্যারিসন রোড

১৩২৪

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

প্রকাশক

শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য।

অন্নদা বুক-ষ্টল,

৮।২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা।

নিউ সরস্বতী প্রেস,

১৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত

১	প্যারীচরণ সরকার	(জীবন-চরিত)		১।০
২	দ্বিজেন্দ্রলাল	(জীবনী ও সমালোচনা)		১॥০
৩	তর্পণ	(জীবন-গাথা ও চিত্র)	...	৸০
৪	ইলিয়াডের গল্প	(সচিত্র)	...	॥০
৫	অডিসির গল্প	(সচিত্র)	...	॥০
৬	পথ-হারা	(উপন্যাস) ...	...	১॥০
৭	শান্তি	(উপন্যাস) ...	...	১৲
৮	সরযূ	(উপন্যাস) ...	...	১৲
৯	ইন্দু	(উপন্যাস)	আট-আনা সংস্করণ	॥০
১০	নেপালচন্দ্রের ঘটকালি	গল্প)	ঐ	॥০

প্রথম পরিচ্ছেদ

অজয় ?"

"কেন মা ?"

'শ্বশুর মিন্‌সের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?"

'এই—এরা সব কেমন আছে তাই জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"জিজ্ঞেস করবার আর কি লোক পেলে না ? আমরা কি সব মরেছি ?"

"জিজ্ঞেস করবেন কাকে ? বাবা ত দেখা করলেন না—এদিকে তিনি ত দেখ্‌ছি সকাল থেকে এসে বসে রয়েছেন।"

বসে থাকে কেন ? আমরা কি মাথার দিব্যি দিয়ে বসে থাকতে বলে ছিলুম ?"

অজয় অধোবদনে উত্তর দিল, "তা কি করবেন, শাশুড়ী ঠাকরুণ কান্নাকাটি করেন, কাজেই এক একবার খবর নিতে আসতে হয়।"

মাতা—হৈমবতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "[illegible] করে না এখানে আস্‌তে? অমন যে সোণার চাঁদ নাতি হ'ল —তা এক[illegible]টি সোণা দিয়ে দেখে যেতে পেরেছিল? ছোট লোক [illegible]"

অজয় ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "গরিব হ'লেই [illegible] ছোটলোক হয় না?"

হৈমবতী অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "[illegible] বলব না—হাজারবার বল্‌ব—বৌকে পাঠাই নি বলে [illegible] 'মেয়ে বিক্রী করেছি না কি?'—বিক্রী করিস্‌না, [illegible] দাওয়ান বাড়ীতে মেয়ে দিতে পেরেছিস্‌ তোর [illegible] ভাগ্যি!"

অজয় মৃদুস্বরে কহিল, "তা যা'ই বল মা—[illegible] প্রাণ ত? মেয়ে পাঠাবে না জান্‌লে কি বিয়ে দিত?"

হৈমবতী ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিলেন, "তবেই ত [illegible] যেত আর কি? অমন ছোটলোকের ঘরের মেয়ে [illegible] নিয়ে এলো আমি যদি বনেদি ঘরের একটা কাল কুরূপ মেয়ে নিয়ে [illegible]তুম, সেও ভাল ছিল।"

এস্থলে মাতা ও পুত্রের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। হৈমবতী পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত ডেপুটী ভবকিঙ্কর মিত্র [illegible] গৃহিণী, ও কৃষ্ণগঞ্জের দাওয়ানবাড়ীর কন্যা। তিনি তাঁহার পরলোকগত পিতার সালিয়ানা ১০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। অজয় তাঁহার একমাত্র

পুত্র। অজয় যখন এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেয় সেই সময়ে হৈমবতী অজয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র মহাশয়দিগের কুলের গৌরব ছিল এবং একমাত্র পুত্র অজয়ের কুলকর্ম্ম করিতে হইয়াছিল বলিয়া হৈমবতী কিছু বিপাকে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সমকক্ষ কুলীনের ও ধনীর ঘরে সুন্দরী কন্যা পর্য্যায় মিলাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মিলিল না। শেষে বাধ্য হইয়া হৈমবতী মহেশখালি স্কুলের হেডমাষ্টার প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা অরুণার সহিত অজয়ের বিবাহ দেন। কন্যা পরমাসুন্দরী—কুলে এবং পর্য্যায়েও রাজযোটক হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের পাঁচ কন্যা ও মাত্র ৫০৲ টাকা বেতন ; সুতরাং তিনি ধনীর গৃহে বিবাহ দিয়া লৌকিকতা রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া বিবাহ দিতেই প্রথমে রাজি হয়েন নাই। শেষে কুলের পর্য্যায় মিলাইয়া অমন সুন্দরী কন্যা আর কোথাও পাওয়া গেল না দেখিয়া বরপক্ষীয়েরাই সাধ্যসাধনা করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে সেই বিবাহ দিতে রাজি করেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু বৈবাহিকের পদ ও ধন-মর্য্যাদার যোগ্য কিছুই দিতে পারেন নাই—হৈমবতী বলিতেন, 'রুলী হাতে দিয়ে মেয়ে পার করেছে।' হৈমবতীর সাধ ছিল বড় ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাদের বংশের (অর্থাৎ পিতৃবংশের—শ্বশুরবংশকে তিনি বংশ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না) মর্য্যাদার অনুযায়ী সাধ আহ্লাদ করিবেন। কিন্তু প্রজাপতি সে 'গুড়ে বালি' দেওয়াতে তিনি প্রথম

হইতেই পুত্রবধূর উপর বিরূপ হইয়াছিলেন এবং নূতন কুটুম্বের নামে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন। ক্রমে যখন অজয় এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ক্রমান্বয়ে এফ্ এ, বি-এ ও এম্ এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল, তখন আর হৈমবতীর আপশোস্ রাখিবার স্থান রহিল না। তৎকালে তিনি দিনের মধ্যে তেত্রিশবার বলিতেন—'কোথায় রাজার ঘরের বৌ নিয়ে আস্‌ব না ডোমের চুপড়ি ধুয়ে একটা মাকাল ফল নিয়ে এলুম—কি বরাত দেখ দেখি!'

অজয় তাহার মাতার স্বভাব জানিত—সে তাঁহার কথার উত্তর দিত না। কিন্তু সেদিন সে তাহার মাতার অন্যায় কথা শুনিয়া প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি ত আর সেধে মেয়ে দিতে আসেন্ নি মা—তোমরাই বলে কয়ে বিয়ে দিয়েছিলে, তখন আর এতদিন পরে এখনো ওকথা বল কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "ব'ল্‌ব না—হাজারবার ব'ল্‌ব—যত-দিন বেঁচে থাক্‌ব খোঁটা দেবো—কিরকম ঠকানটা ঠকিয়েছে আমাকে!"

অজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেবো বলে না দিলে ঠকান হ'ত—দেবেন্ ত আর বলেন্ নি, তখন আর ঠকান ব'ল্‌ছ কেন?"

হৈমবতী অধিকতর বিরক্তিস্বরে কহিলেন, "যা' যা' বকিস্‌নি—হা-ঘরের বেটী তোকে গুণ করেছে।"

অজয় পুনরায় সহাস্য-বদনে কহিল, "আবার সে বেচারীকে টান কেন মা? সে ত কোন কথাতেই থাকে না।"

হৈমবতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "মুখ-বুজুনি ডাইনি—ছেলে খাবার যম—তুই কায়েতের ঘরের গরু তাই আবার তার হয়ে লাগ্‌তে এসেছিস্—চারটে পাশ করেছিস্ না উনুনের পাঁশ করেছিস্। তোর চেয়ে মুখ্যু সুখ্যুদের আক্কেল আছে।"

অজয় কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার গর্ভ-ধারিণীর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া গেল। হৈমবতী চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিলেন, "ফের যদি আমার মুখের ওপর কথা কইবি ত ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। যে বিয়ে করে এনেছে সে কখনো আমার মুখের সামনে উঁচুগলা করে কথা কইতে পারে নি, আর আজ তোর মুখ ঘোরানি সইতে যাব? আমাব গলায় দড়ি। খবরদার আমার কথার জবাব দিবি না।"

হৈমবতী তাঁহার স্বামীর উল্লেখ করাতেই তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা অজয়ের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—মাতার হস্তে পিতার অশেষ দুর্গতির কথা স্মরণে আসিল। অজয়ের পিতা বয়সকালে নিতান্ত নিরীহ ছিলেন না—'কড়া-হাকিম' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। কিন্তু রায়-বাহাদুরের বাহাদুরি এজলাসে বসিয়া উকিল আমলা ও মামলা-বাজদিগের নিকটেই প্রকট হইত, বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর

কাছে তাঁহার কোন জারিজুরি খাটিত না—তাহার হাকিমি মেজাজ 'সিকেয় তোলা' থাকিত। গৃহিণীর কোনও কথায় প্রতিবাদ করিলে গৃহিণী দাস-দাসীদের সমক্ষে ডেপুটীবাবুর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে 'খেলো' করিয়া দিতে কালবিলম্ব করিতেন না। অজয়ের সেই কথা স্মরণ হওয়াতেই সে যে এতক্ষণ মাতাকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল সেই আত্ম-বিস্মৃতির জন্য সে মনে মনে নিজেই লজ্জা পাইল এবং মাতার শেষ কথার উত্তর না দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইল। সেই সময়ে পার্শ্বের কক্ষের দিকে অজয়ের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সে দেখিতে পাইল তাহার পিতৃস্বসা বিষ্ণুপ্রিয়া হস্ত-সঙ্কেত করিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তৎকালে আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু মাতা-পুত্রের বাদানুবাদ শুনিয়া তিনি আহ্নিকের মন্ত্র ভুলিয়া যাইতে ছিলেন। শেষে তিনি এমন অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি অজয়কে দেখিয়া কোনরূপে আহ্নিক সারিয়া, গলবস্ত্র হইয়া ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া, তাহাকে বলিলেন, "আয়—আমার সঙ্গে আয়।"

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া অজয় বলিল, "না পিসিমা এখন ওখানে যেওনা—ঝগড়া হবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া হৈমবতী যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। অজয় উভয়কেই

চিনিত, সে প্রমাদ গণিয়া ত্বরিত-পদে একেবারে বহির্বাটীতে নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া, ভবকিঙ্করের জ্যেষ্ঠা সহোদরা। তাঁহার বৰ্দ্ধিষ্ঠ-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিতৃ-গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বাল্যবয়সে মাতৃহীনা ভবকিঙ্করকে তিনি 'মানুষ' করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুরালয় হইতে অলঙ্কারে ও নগদে প্রায় দশ হাজার টাকা আনিয়া পিতার করে অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সেই অর্থ হইতেই ভব-কিঙ্করের উচ্চ বিদ্যা-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়; উদ্বৃত্ত যাহা ছিল—তাহা ভবকিঙ্করের নিকটেই গচ্ছিত ছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া, হৈমবতীর নিকটে আসিয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "বউ, তোমার কি রকম বিবেচনা? অতবড় ছেলেকে কি অমন করে যা মুখে আসে তাই বলে?"

হৈমবতী বিরক্তভাবে বলিলেন, "যাও যাও, তোমাদের আর সালিশী করতে হবে না—তোমরাইত আদর দিয়ে দিয়ে ওর আস্পদ্দা বাড়িয়েছ, নইলে ওর সাধ্যি কি যে আমার কথার জবাব দেয়?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, "জবাব কি দিত বউ? তুমিই ত জোর করে দেওয়ালে। ছেলেপুলের বাপ হয়েছে এখনও কি ছোট ছেলের মতন যা'তা' বল্‌তে আছে? শত্তুরের মুখে ছাই' দিয়ে আমার সনৎই পাঁচবছরের হতে চল্‌লো।"

হৈমবতী বলিলেন, "ও কায়েতের ঘরের গরু বৌএর হয়ে ঝগড়া করতে আসে কেন?"

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিলেন, "ঝগড়া করেনি বউ, তুমি নেহাৎ অন্যায় অসঙ্গত বল্‌ছিলে—তাই সত্যি কথাই বল্‌ছিল।"

হৈমবতী তীব্রভাবে কহিলেন, "মিছে বোকোনা বাপু ও সব একচোখো কথা আমি শুনতে চাইনি—আমার খাবে আমার পরবে, আবার আমার মুখের ওপর কথা কইবে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিলেন, "তোমারই বা খেতে পরতে গেল কেন—ভাই কি আমার রোজগার করে নি—না পেনসন্ পায় না?"

হৈমবতী মুখ ঘুরাইয়া তাচ্ছিল্য ভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন, "ওঃ, চারশো টেক্‌লো পেন্সেনের আর নাড়া দিও না। বাড়ী ভাড়া দিতে হ'লে চার দিনে ফুটকড়াই হয়ে যেত।"

ভবকিঙ্করেব ডেপুটীগিরিতে শেষ দশায় আটশত টাকা অবধি বেতন উঠিয়াছিল—কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর পৈতৃক বিষয়ের আয় তদপেক্ষা অধিক ছিল। সেই হেতু এবং তাঁহার স্ত্রীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের কথা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়াতে ভবকিঙ্করকে তাঁহার বন্ধুগণ 'স্ত্রীর রক্ষিত' বলিয়া রহস্য করিত; ভবকিঙ্করের দেশে—রাজীবপুরে—একখানি ভদ্রাসন বাটী ছিল, কিন্তু হৈমবতী সেই বাটীতে গিয়া বাস করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতার কলিকাতায় যে বাটী

ছিল সেই বাটীতেই ভবকিঙ্কর পেন্সন পাইয়া সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেওয়ানজিদের কৃষ্ণগঞ্জের বৃহৎ ভদ্রাসন বাটীও হৈমবতীই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বাটীতে হৈমবতীর অনুমতি ক্রমে তাঁহার পিতার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ বসবাস করিতেন। ভবকিঙ্করের শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে বিষ্ণুপ্রিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি, অনর্থক বাটী ভাড়া দিবার ওজরে, ভবকিঙ্কর গ্রাহ্য করেন নাই। এক্ষণে হৈমবতী সেই বাটীতে বাসের 'খোঁটা' দেওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়া ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দিলেন, "কেন তোমার বাপের বাড়ী না পেলে কি আর আমাদের মাথা গোঁজবার জায়গা জুট্‌ত না, না তোমার টাকা নইলে আমাদের অন্ন জুট্‌তো না?"

হৈমবতী সে কথা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "জুট্‌তো কি না জুট্‌তো সে খবরে আমার দরকার নেই কিন্তু আমার বাড়ীতে বসে যে আমাব ছেলে ভাঙ্গাবে, ছোট লোকের-মেয়ে বউয়ের হয়ে মায়া-কান্না কাঁদবে, সে সব হবে টবে না। তোমার গিন্নীপনা ঢের সয়েছি আর তা সইব না—সইব না—স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি—যাও যাকে লাগাতে হয় লাগাওগে যাও।"

বিষ্ণুপ্রিয়াও তীব্রস্বরে কহিলেন, "লাগাবো আর কার কাছে? ভাইকে কি আর মানুষ রেখেছ? তাকে ভেড়া বানিয়ে

এনেছ—নইলে তোমার নথনাড়া সই এমন বাপের মেয়ে আমাকে পাওনি। ভালমানুষ বৌটাকে নিয়ে বৌকাট্‌কীপনা করবে—এক বাড়ীতে থেকে চোকের সাম্‌নে দেখে তা সই কি ক'রে বল? নেহাৎ অসহ্য হ'লে তবে দুটো কথা বলি।"

হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "না তা বল্‌তে পাবে না—যে সইতে পার্‌বে সে থাক্‌বে—যার না সইবে সে অন্য পথ দেখুগ্‌। বাড়ী আমাব বাপের—"

বিষ্ণুপ্রিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "বউ, বাপের বাড়ী বাপের বাড়ী করে আর নাড়া দিও না। বাপও সবারই থাকে—আর বাপের বাড়ীও থাকে।"

হৈমবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি আমার বাপ তুল্‌লি—সরে যা এখান থেকে—"

সেই সময়ে ভবকিঙ্কর তাহার বাতগ্রস্ত দেহের ভার এক গাছি মোটা যষ্টিতে রক্ষা করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার ভূতপূর্ব্ব হাকিমী গাম্ভীর্য্যের সমারোহ সহকারে হস্ত-স্থিত যষ্টি ভূমিতে ঠুকিয়া বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "এত চেঁচামেচি কেন গো—আমাকে কি তিষ্ঠতে দেবেনা না কি?—তোমাদেব গণ্ডগোলের চোটে কান ঝালাফালা হয়ে গেল যে?"

হৈমবতী দারুণ অবজ্ঞার সহিত ভবকিঙ্করের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যাও, যাও, আব ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ কোরো না। বোনের

কুঁচুলে নাড়ী টন্ টন্ করে উঠেছিল—এলেন কোঁদল কর্‌তে, আবার তুমিও এসে জুটেছ—আর যে যেখানে আছে সব ডেকে এনে আমাকে চিবিয়ে খাও—তাহলে তুমিও বাঁচো আর আমারও হাড় জুড়োয়।"

হৈমবতীর তাড়নায়, জলৌকার মুখে লবণ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, ভবকিঙ্করেরও নিমিষে সেই দশা ঘটিল। তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, "কেন—কেন, হয়েছে কি? দিদি—তোমাকে দু শ' দিন বলেছি—খামকা গণ্ডগোল করে ওদের রাগিও না—শেষে মাথা গরম হয়ে যাবে। ওরে অ পতে—আন্, আন্, চট্ করে পাখা খানা আন্—"

পরিচারক পতিতপাবন বাবুর ব্যস্ততায় মতিভ্রান্ত হইয়া আসিয়া বলিল, "বড়পাখা ত বাড়ীর ভেতর নেই—বাইরের ঘরে চাবি দেওয়া আছে।"

ভবকিঙ্কর খানসামার নির্ব্বুদ্ধিতায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "বেটা তোকে কি আমি আড়ানি পাখা আন্‌তে বলেছি—হাত পাখা নিয়ে আয়—"

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিল "ঝালর দেওয়া খানা? ভবকিঙ্কর কহিলেন, "বেটা আহাম্মক—বারদিগর কথার জবাব দিবি ত এক লাঠিতে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।"

যষ্ঠি উঠাইতে গিয়া ভবকিঙ্করের পতন সম্ভাবনা দেখিয়া

পতিতপাবন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং পরে ছুটিয়া গিয়া একখানি তালপত্রের পাখা আনিয়া মনিবের হস্তে দিল। ভবকিঙ্কর সেই পাখা হৈমবতীর শিরোদেশে ব্যজন করিতে উদ্যত হইতেই, হৈমবতী পাখাখানি তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দারুণ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "যাও, যাও—আর আদর কাঁড়াতে হবেনা—ঢের হয়েছে—সাতগুষ্ঠিতে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে—"

ভবকিঙ্কর অপ্রতিভ হইয়া সহোদরার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেন গো দিদি ওদের সঙ্গে লাগ্‌তে এস বল দেখি—একে বায়ু'ধাতে শরীর খারাপ হয়ে গেছে শেষকালে মাথা গরম করে দিয়ে আমাকে একটা ফ্যাঁসাদে ফেলে দেবে দেখ্‌ছি।"

প্রভুর মুখে গৃহিণীর স্বাস্থ্যহানীর কথা শুনিয়া পরিচারক পতিতপাবন, তাহার দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছে ভাবিয়া ভীতনেত্রে কিয়ৎক্ষণ হৈমবতীর বরাঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কোনও দিন গৃহিণীর স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্যের লক্ষণ লক্ষ্য করে নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভ্রাতার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা যা বকিস্‌নি। তুই কি আর পুরুষ মানুষ আছিস্—মেয়ে মানুষের অধম হয়ে গেছিস্। নইলে চোখের সামনে অমন লক্ষ্মী বৌটাকে কি নাকালই না করছে—তা বৌএর হয়ে একটা কথাও কি কোন দিন বল্‌তে নেই? আবার অজয়কে বলে কিনা বৌএর বশ! নিজে যে তোকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে—"

সেই সময়ে ভবকিঙ্করের দৃষ্টি তাহার স্ত্রীর মুখের দিকে পতিত হওয়ায় সে দেখিল হৈমবতী ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কাঁপিতেছেন। তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া ভবকিঙ্কর তাহার ভগ্নীকে কহিলেন, "অ দিদি তোমার দুটী পায়ে পড়ি—থামো গো থামো।"

হৈমবতী কহিল, "থাম্‌বে কেন বলুক্‌, ভগবান মুখ দিয়েছেন যত পারে বলুক্‌। আমারই বাড়ীতে বসে আমার বুকেই ভাতের হাঁড়ি নামাক্‌। চারকাল জ্বালালে! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনো ওর কথা সইতে যাব—কেন?—"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন "হ্যাঁ তুমি মুখ বুজে সয়ে থাক্‌বার লোকই বটে! বল্‌তে বাকি রাখ্‌ছ কি? ধরে মারতে বাকি রেখেছ বইত না—"

ভবকিঙ্কর অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সেইসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে আসিয়া মিনতি করিয়া পুনরায় কহিলেন, "অ দিদি থাম গো থামো—তোমার পায়ে পড়ি থামো—"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমার পায়ে পড়তে হবে না আমি এই চল্‌লুম। গিন্নীকে মাথায় করেছ—তারই পা-পূজো করগে।" এই কথা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে নিজের কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ভবকিঙ্কর তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "তোমাদের

জ্বালায় কি শেষে আমায় বাড়ী ছাড়্তে হবে না কি? কি ফ্যাসাদেই পড়েছি—দিন রাত্রি কান ঝালাপালা করে দিলে।"

হৈমবতী ভবকিঙ্করের দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "যাও যাও আর মউটুস্কিপানা কর্তে হবেনা—পোড়া লোকের হাতে পড়ে হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল—যাও সরে যাও"—এই কথা বলিয়া হৈমবতী দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান ভবকিঙ্করকে পাশ্ কাটাইয়া যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবেন অমনি ভবকিঙ্করের যষ্ঠিতে পা আটকাইয়া হৈমবতীর পদস্খলনের উপক্রম হইল এবং ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গিয়া ভবকিঙ্কর নিজে সশব্দে পড়িয়া গেলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন ভবকিঙ্কর ভূমিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে পতে শীগ্‌গির আয় রে—সব্বনাশ হলো রে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই পতনের ফলে ভবকিঙ্কর যে শয্যাগ্রহণ করিলেন তাহা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল না। প্রথমে তাঁহার পতন-জনিত ব্যথায় বাত আশ্রয় করিল, পরে বহুদিনের সঞ্চিত কঠিন বহুমূত্র রোগেরও প্রকোপ বৃদ্ধি হইল। প্রথমে এলোপ্যাথী চিকিৎসা হইল। বাঙ্গালী ডাক্তারের চিকিৎসায় উপকার না হওয়াতে প্রত্যহ সাহেব ডাক্তার আসিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি পীড়া সমভাবেই রহিল। ডাক্তার বলিলেন—সারিতে বিলম্ব হইবে। এমন সময় একদিন কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হৈমবতীর স্বর্গীয় পিতার অনুগত কবিরাজ বটুকভৈরব বিদ্যার্ণব 'জামাইবাবু'কে দেখিতে আসিয়া হৈমবতীকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "বাবুর চিকিৎসা কিছুই হচ্ছে না, পীড়া কঠিন, ডাক্তারদের এ রোগের ওষুধ নেই, যদি বাঁচাতে চাও ত কবিরাজি চিকিৎসা করাও।" তাঁহাদের কোন্দল থামাইতে গিয়া ভবকিঙ্কর পড়িয়া গিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন এই কথার প্রচার হওয়াতে হৈমবতী কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন। সেইহেতু স্বামীকে শীঘ্র রোগ-মুক্ত করি-বার জন্য তিনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়াতে তিনি ক্রমশঃ বড়ই ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। বটুকভৈরবের কথা শুনিয়া হৈমবতী কহিলেন, "আমিও ত তাই দেখছি, কেবল মুঠো মুঠো টাকাই নিয়ে যাচ্ছে। রোগ ত যেমন তেমনিই রয়েছে। তা কোন্ কব্‌রেজকে ডাকাই বলুন ত? রাণাঘাটের যোগেন কব্‌রেজকে কি এখানকার দ্বোয়ারী কব্‌রেজকে আন্‌লে হয় না?

বটুকভৈরব বলিলেন, "ওরা সব—কি জান—বরাতে করে" খাচ্ছে। সেবার শক্তিপুরের বড় তরফের জমিদারবাবুর বাত-শ্লেষ্মা বিকার হ'ল। হোমরা চোমরা সব সাহেব গেল—শেষে এখানকার মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশরাও বাকি রইল না—কিন্তু রোগ একচুল কম্‌ল না। শেষে ছোটবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌লেন—কব্‌রেজ মশায়, 'আপনি না দয়া কর্‌লে দাদার ত প্রাণটা রক্ষে হয় না।' সাতদিন চিকিৎসা করেই রুগীকে পথ্য দিয়ে দিলুম্—সে কথা শুনেছ ত?"

হৈমবতী সন্দিহান ভাবে কহিলেন, "তিনি ত শুনেছি মারা গেছেন?"

বটুকভৈরব বলিল, "আরে—সে তার সপ্তা দুই পরে। আমি ত পথ্য দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তা—তোমাদের যা'কে ইচ্ছে দেখাতে পার। কিন্তু আমি বুক ঠুকে বল্‌তে পারি—দিনদশেক আমার ওষুধ খেলেই রুগী খাড়া হয়ে উঠ্‌বে।"

পিত্রালয় সংক্রান্ত স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেরই উপর

হৈমবতীর অশেষ মমতা। তিনি বটুকভৈরবকে কহিলেন, "তা হলে আপনিই না হয়, চিকিৎসা করুন্।"

বটুকভৈরব কহিল, "তা যেন করলুম, তবে কি জান—হাত দিয়ে ত আর রোগ তাড়াতে পার্‌ব না। কঠিন পীড়ায় কঠিন ঔষধের দরকার। 'বৃহৎকস্তুরিবল্লভ-মণিমুক্তাদি-রসায়ন প্রস্তুত কর্‌তে হবে—মৃগনাভি, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য আরও সব দামী জিনিস ভস্মকরে তবে ঔষধ তৈরী হবে—সে ত সহজ কথা নয়—অনেক খরচের দরকার।"

হৈমবতী তাঁহার সরকারকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, 'কব্‌রেজ কাকা যত টাকা চান্—তা দেবেন।"

বটুকভৈরব দুই দিনে পাঁচ শত টাকা লইয়া গিয়া তৃতীয় দিবসে কলুটোলা হইতে দুই টাকা মূল্যে সপ্তাহ কাল সেবনের মত মধুমালতী-রস এবং সাত আনা দিয়া সাত মোড়ক আমলাদি পাচন কিনিয়া লইয়া গিয়া হৈমবতীকে বলিল "ঔষধ তৈরী করে এনেছি—আজ থেকে চিকিৎসা আরম্ভ কর্‌ব।"

হৈমবতী অজয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, "ডাক্তারদের আস্‌তে বারণ করে পাঠাও, আজ থেকে কৃষ্ণগঞ্জের কব্‌রেজ কাকা চিকিচ্ছে কর্‌বেন।"

অজয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে? বটুক ঠাকুর? তিনি ত সেখানকার স্কুলে পণ্ডিতি কর্‌তেন—তিনি আবার কবিরাজ হলেন কবে?"

হৈমবতী কহিলেন, "না না তোরা জানিস্‌নি আমরা ছেলেবেলায় ওঁর কত ওষুধ খেয়েছি। শক্তিপুরের বড় বাবুকে আরাম করে ছিলেন—ওঁর খুব হাত যশ।"

ডাক্তারী চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া বৈদ্য দেখাইতে অজয়ের কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু বটুকভৈরবের মত হাতুড়ের হাতে পিতার চিকিৎসার ভার দিতে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। অজয় অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু হৈমবতী কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করিলেন না—বলিলেন "ওঁর চিকিচ্ছে যদি না করাও, আর রোগ বেড়ে যায়, তাহ'লে আমি অনর্থ কর্‌বো কিন্তু বলে দিচ্ছি।" অগত্যা অজয় আর বাধা দিল না। ফলে, চারি পাঁচ দিনে ভবকিঙ্করের পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার ডাক্তারী বা কবিরাজি ঔষধ সেবন করিবার সামর্থ্য রহিল না। সুতরাং এলোপ্যাথী ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথীর আশ্রয় লইতে হইল (তখনও ইন্‌জেক্‌সনের প্রথা প্রসার লাভ করে নাই); হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তিন দিন হইবার পর ডাক্তার বলিলেন—তাঁহার ঔষধের আশ্চর্য্য ফল হইয়াছে। কিন্তু তিনি দর্শনী পকেটে পূরিয়া বিদায় লইবার কয়েক মিনিট পরেই রোগীর নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই ভবকিঙ্করের ভবলীলা সাঙ্গ হইল—অবধৌত বা দৈব চিকিৎসা করাইবার আর অবকাশ পাওয়া গেল না!

ভবকিঙ্করের শ্রাদ্ধ ব্যাপার লইয়াও অজয়ের সহিত

তাহার মাতার মতভেদ হইল। অজয় বলিল তাহাদের রাজীবপুরের পৈতৃক বাটীতে, কিম্বা কলিকাতার বাটীতেই শ্রাদ্ধ হউক।

হৈমবতী বলিলেন "তা কি হয়! দাওয়ান বাড়ীর বিষয়-ভোগ কর'ছি, তাঁদের কৃষ্ণগঞ্জের বাড়ীতে অনেকদিন কাজ কর্ম্ম হয় নি, সেই খানেই শ্রাদ্ধ করতে হবে।"

অজয় বলিল, "এই শোকের কাজে আর বড়লোক-খাওয়ানর ধুমধাম করে হৈ চৈ করবার দরকার নেই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর গরিব দুঃখীদের সেই টাকা দিলেই ভাল হয়।"

হৈমবতী বলিলেন, "তা কি হয়ে থাকে! অনেক দিন দাওয়ান বাড়ীতে কোনো ঘটাব কাজ কর্ম্ম হয় নি, শ্রাদ্ধটা ঘটা করেই কর্‌তে হবে।"

অশৌচান্ত হইবার এক পক্ষ পূর্ব্বে হৈমবতী কৃষ্ণগঞ্জে গিয়া, তাহার পিতার স্নেহপাত্র হরিনারায়ণ চৌধুরীর উপর শ্রাদ্ধের সমারোহের বন্দোবস্ত করিবার ভার দিলেন। হরিনারায়ণও জমিদার, কিন্তু সে চরিত্রহীন ও অশিক্ষিত বলিয়া তাহার উপর পিতার শ্রাদ্ধের কোনও ভারার্পণ করিতে অজয়ের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হৈমবতী অজয়ের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। অষ্টাহ কাল ব্যাপী ধুম ধাম চলিল। ভবকিঙ্করের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়দের পরিত্যক্ত ভদ্রাসন বাটী সরগরম হইয়া উঠিল। দেওয়ানদের কুলপুরোহিত রঘুনাথ-

তর্কবাগীশ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় উপলক্ষে তাঁহার নিজের ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর নিরক্ষর আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে ছিল তাহাদেরই আনাইয়া পণ্ডিতের বিদায় দেওয়াইলেন। দূর-দূরান্তরের বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া কলিকাতার ধনাঢ্য বাবুদের অনুকরণে চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের এরূপ অত্যধিক আয়োজন করা হইল যে সে অঞ্চলের ধনী সমাজেও সেই অপব্যয়ের জন্য দেওয়ান বাটীর কন্যার জয় জয়কার ধ্বনিত হইতে লাগিল। দরিদ্র ভিক্ষুকদের ভোজ দিবার হাঙ্গামা পোয়াইতে হরিনারায়ণ বাবু অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া তাহাদের কাহাকেও বা জলপান ও বাতাসা আর কাহাকেও বা অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হইল। সভারোহণের দিন ও বৃষোৎসর্গের দিন কলিকাতার নামজাদা কীর্ত্তনওয়ালী ত্রিলোকতারিণী ও তাহার সহচরীবৃন্দকে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রাদ্ধ বাসরে তাহাদের কলকণ্ঠের মাথুর ও বিরহ এরূপ জমিয়া উঠিল যে হরিনারায়ণ বাবু নিজের গাত্রের শাল খুলিয়া ত্রিলোক-তারিণীকে সভাস্থলে বক্‌সিস্ দিলেন এবং সভাভঙ্গে তাহাকে নিজের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বিদ্যাসুন্দর গাওয়াইয়া তবে বিদায় দিলেন!

কৃষ্ণগঞ্জে স্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধ উৎসব সম্পন্ন করিয়া হৈমবতী কলিকাতায় আসিয়া অজয়কে জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা স্বামীর পেন্সন বন্ধ হওয়াতে তাঁহার যে আয় কমিয়া গিয়াছিল, জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়া সেই

ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়েন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অজয়কে জমিদারীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, অনাবৃষ্টির জন্য তাহাদের শস্য নষ্ট হইয়াছে সংবাদ পাইয়া অজয় দুঃস্থ প্রজাদের সে বৎসরে দেয় কর, কাহারও বা আংশিক ভাবে, কাহারও বা এককালীন ছাড়িয়া দিয়া আসিল। তদবধি হৈমবতী অজয়কে মহাল শাসিত করিতে না পাঠাইয়া, নিজের শাসনেই রাখিয়া দিলেন।

জমিদারী-তত্ত্বাবধানের যোগ্যতা তাহার নাই, মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া অজয় কলিকাতার কোনও একটা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের পদের জন্য আবেদন করিয়াছিল। অজয় ইতিহাসে এম এ পরীক্ষা দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া তাহার উক্ত অধ্যাপকের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে কথা শুনিয়া হৈমবতী কহিলেন, তাঁহাদের (অর্থাৎ তাঁহার পিতৃকুলের) কেহ কখন চাকরী করে নাই, সুতরাং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হইয়া অজয়ের চাকরী করা হইবে না—কলিকাতায় থাকিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। ম্যানেজার বাবু তাহাকে সাহায্য করিবেন ও প্রয়োজন হইলে মহালে যাইবেন। প্রকৃত পক্ষে ম্যানেজার বাবুই সমস্ত কার্য্য করিতেন, অজয় নাম মাত্র তাঁহার কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং অবশিষ্টকাল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিত। হৈমবতীর ব্যবস্থা কিন্তু অজয়ের মনঃপূত হয় নাই। খরচপত্রের

ভার হৈমবতী নিজের হস্তেই রাখিয়াছিলেন। সামান্ত অর্থের প্রয়োজন হইলেও অজয়কে মাতার নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইতে হইত। সাংসারিক কোন বিষয়েই অজয়ের কর্ত্তৃত্ব চলিত না।

অজয়ের পুত্র সনৎ, পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিতেই তাহার 'হাতে খড়ি' দেওয়া হইয়াছিল। অজয় তাহার শিক্ষার জন্ত বাটীতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং কিছুদিন পরে তাহাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। তাহার পড়াশুনা বেশ চলিতেছিল এমন সময় কৃষ্ণগঞ্জের জনার্দ্দন মণ্ডল একদিন কলিকাতায় আসিয়া হৈমবতীকে বলিল, "দেখেন মা ঠাকরুণ, জমিদার বাড়ীর ছেলেব আগে শুভঙ্করীটায় পাকা হওয়া দরকার, তারপর ইঞ্জিরি-কিড়িংমিড়িং যা পড়ে পড়ুক। নাতীকে বছর দুই আমার হাতে দিয়ে দেখেন কি রকম তৈয়েরী করে দেই।"

জনার্দ্দন মণ্ডল হৈমবতীর পিত্রালয়ে গুরুমহাশয়গিরি করিত। দেওয়ানজীরা তাঁহাদের বাটীতে তাহাকে পাঠশালা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পাঠশালায় গ্রামের গরিব ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শিশুপুত্রেরা মাসিক /০ ও ৵০ বেতনে তালপাতায় লেখা শিখিত। হৈমবতীর পিতার মৃত্যুর পরও জনার্দ্দন সেই পাঠশালা চালাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার প্লীহায় উদর পূর্ণ এবং অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। তদুপরি

গ্রামের ভদ্রলোকেরা কলিকাতায় আসিয়া বাস করাতে তাহার, পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়া, উদরান্নের সংস্থান করা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। সেই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে ভাবিল কলিকাতায় আসিয়া হৈমবতীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার আহার ঔষধ দুয়েরই উপায় হইতে পারে। কৃষ্ণগঞ্জের দেওয়ানবাটীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর পরামর্শে জনার্দ্দন সেই পন্থাই অবলম্বন করিল। হৈমবতী তাহাকে দশটাকা বেতনে পৌত্রের গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিলেন। অজয় আপত্তি করিল—শুভঙ্করী বড় হইলে শিখিবে, এ বয়সে ছেলেদের যাহা শিখিতে আনন্দ হয়—বস্তুর জ্ঞান বাড়ে, তাহাই আগে শিক্ষা দেওয়া দরকার, ইত্যাদি। হৈমবতী সে কথা শুনিলেন না। অজয়ের ইংরাজি শিক্ষার উপর হৈমবতীর কোনও শ্রদ্ধা ছিল না—জমিদারীর আয়-বৃদ্ধির ব্যাপারে তাহার অক্ষমতা দেখিয়া সেই অশ্রদ্ধা বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। তিনি অজয়কে ও সনৎকে একই পর্য্যায় ফেলিয়াছিলেন। স্থির হইল সনৎ প্রাতে একঘণ্টা গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িবে।

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—শুধু বাবুর ছেলেটাকে পড়াইয়া জনার্দ্দনের ভাত হজম করা ভার হইল। সে হৈমবতীকে বলিয়া ঠাকুরদালানে একটী পাঠশালা খুলিয়া বসিল এবং তাহাতে তাহার উপরি রোজগারের উপায় করিল। কলিকাতায়

পাঠশালায় ভদ্রঘরের ছাত্র মিলিল না—পাড়ার ছুতার কামার নাপিত ধোপা প্রভৃতিদের চৌদ্দ পনরটী ছাত্র জুটিল।

একদিন প্রাতঃকালে জনার্দ্দন একহস্তে ডাবাহুঁকা ও অপর হস্তে একগাছি বেত লইয়া, ঠাকুরদালানে একখানি ছোট চৌকির উপর বসিয়া ছাত্রদের একে একে আগমন লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময় সনতের মাতামহ প্রাণকৃষ্ণ বাবু তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রকে দেখিতে আসিলেন। তিনি কন্যাকে দর্শনের জন্য বৈবাহিকা ঠাকুরাণীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ঠাকুরদালানের পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিলেন পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথমে যে দশজন ছাত্র একে একে আসিল, জনার্দ্দন তাহাদের কিছু বলিল না, তাহার পরে যে শিশুটী আসিল জনার্দ্দন তাহাকে ডাকিল, 'অম্বিকে—এদিকে আয়!' সে অগ্রসর হইতেই জনার্দ্দন তাহাকে বলিল, 'হাত পাত'। সে সভয়ে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিতেই জনার্দ্দন তাহার হস্তে বেত্রদণ্ডের অগ্রভাগ গুঁজিয়া দিল। তৎপরে যে আসিল তাহার হস্তে এক ঘা বেত মারিল। তৎপরে যে আসিল, তাহাকে ডাকিতেই সে গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড সঞ্চালন দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। জনার্দ্দন চক্ষুদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া বেত্র সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিল—"আয়—এদিকে আয়—নইলে পিঠের চামড়া তুলবো।" সে কম্পিত কলেবরে নিকটে যাইতেই জনার্দ্দন তাহার করে দুইবার

বেত্রাঘাত করিলেন। সে 'বাবাগো গেছিগো'—বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দূরে গিয়া পাততাড়ি খুলিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপরে যে আসিল, তাহাকে ডাকিতেই সে সপ্রতিভ ভাবে জনার্দ্দনের নিকটে গিয়া তাহার হস্তে শালপত্রে আচ্ছাদিত তাম্রকূটের একটী মোড়ক দিয়া কহিল 'ফোজদুরী বালাখানার মিঠেকড়া মশায়—দা'কাটা নয়।" জনার্দ্দন মোড়কটি টিপিয়া বলিল, "কতটুকু এনেছিস্‌রে বেটা? এ যে ছিলিম দুইও হবে না।"। ছাত্র বলিল, "নইলে বাবা টের পাবে যে?" জনার্দ্দন অপ্রসন্ন ভাবে কহিল, "আচ্ছা যা'—বস্‌গে যা" তাহার তিন ঘা বেত্রাঘাত মাফ্‌ হইয়া গেল দেখিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া পাততাড়ির মাদুর বিছাইয়া বসিল।

সেই সময়ে জনার্দ্দনের দৃষ্টি দূরে উপবিষ্ট দুইটী ছাত্রের দিকে পড়িল। তাহারা তালপাত ছাড়িয়া শ্লেটে উঠিয়াছে। তাহাদের একজন শ্লেটে একটী মনুষ্য মুণ্ড আঁকিতে ছিল। পার্শ্বের ছাত্রটী তাহাকে সেই চিত্রে শ্মশ্রু ও শিখা যোগ করিয়া দিবার পরামর্শ দিতেছিল এবং সে নিবিষ্টমনে বন্ধুর উপদেশ পালন করিতেছিল। এমন সময়ে জনার্দ্দন হাঁকিল, "হ্যাঁদে এ-ই ক্যাবলা, নিয়ে আয়্‌ ত তোর শ্লেট, দেখি কি জেলাপী কচুরী ল্যাখছিস্‌।" গুরুমশায়ের আহ্বান শুনিয়া ভাবী চিত্রকরের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল—সে চিত্রটী মুছিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়

তাহার পূর্ব্বোক্ত উপদেশদাতা বন্ধু, তাহার হস্ত হইতে শ্লেটখানি কাড়িয়া লইয়া গিয়া জনার্দ্দনের হস্তে দিয়া বলিল, "এই দেখুন গুরুমশায় আপনার চেহারা এঁকেছে—এই যে দাড়ি এই যে টিকি।" গুরুমহাশয় ক্রোধ-কম্পিত স্বরে তাহাকে ধমক দিলেন, "তুই চুপকর হারামজাদ।" পরে সনতের দিকে চাহিয়া চিত্র-অঙ্কন কারীকে দেখাইয়া বলিলেন, "সনৎ, যাওত বাবা, গুয়োটার কান তুটো আচ্ছা করে মলে দিয়ে এস ত?" সনৎকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জনার্দ্দন পুনরায় বলিল, "যাও—শীগগির যাও, বেটাচ্ছেলের কানতুটো পাকিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে এস।"

অগত্যা সনৎ উঠিয়া কেবলরামের কাণের চারি ধারে শিথিল মুষ্টি বেষ্টন করিয়া কর্ণমর্দ্দনের অভিনয় করিয়া আসিল। তাহাতেই লজ্জায় ও করুণায় তাহার নিজের কর্ণদ্বয় লাল হইয়া উঠিল।

জনার্দ্দন কেবলরামকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "একরত্তি ছেলের ছবি ল্যাখা হচ্ছে— বাপের মাথা ল্যাখা হচ্ছে। ল্যাখ্ বেটা আঙ্ক আস্ক ল্যাখ্।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু পার্শ্বের কক্ষ হইতে পাঠশালার সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, এমন সময় বাটীর ভিতরে যাইবার জন্য তাঁহার ডাক আসিল। অন্দর মহলে কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু তাঁহার কন্যা অরুণাকে কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "দেখ, একটা কথা বলে যাই, ও গুরুমশায়ের কাছে

আর সনৎকে পড়্‌তে দিও না—লোকটার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই—গণ্ড মুখ্যু। আর ঐ সব ছোট লোকের ছেলেদের কুসংসর্গে থেকে ঐ গুরুমশায়ের কাছে দিন কতক শিক্ষা পেলেই সনতের দফা রফা হয়ে যাবে। স্কুলে পড়্‌ছে, মাষ্টার রয়েছে, আবার গুরুমশায় কেন ?”

অরুণা শঙ্কিত ভাবে বলিল,—“উনি শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের বাপের বাড়ীর লোক, ওঁকে ছাড়াবার যো নেই বাবা।”

প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, “ওকে না হয় অমনি সাহায্য করুন্ না, কিন্তু ওর হাতে ছেলেকে শেখাবার ভার দিও না। অজয়কে বোলো—লোকটা গালাগালি, চুরী এই সব শেখাচ্ছে। এই কথা বলিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবু ঠাকুরদালানে যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিলেন।

অরুণা কহিল, “ওঁকে রাখবার সময়, ওঁরা বারণ করেছিলেন —শাশুড়ীঠাক্‌রুণ সে কথা শোনেন নি।”

প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, “অন্য যা কিছু বল্‌বেন তা অবশ্য অজয়কে মাথা পেতে শুন্‌তে হবে। কিন্তু ছেলের লেখা পড়ার বিষয় বেয়ান ঠাকরুণ মেয়ে মানুষ কি বুঝ্‌বেন! ওরকম অসঙ্গত কথা বল্‌লে চলবে কেন? অজয়কে ভাল করে তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে বোলো।”

এই কথা বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু দ্বারের কাছে অগ্রসর

হইতেই শুনিতে পাইলেন কে একজন দ্রুতপদে সেই কক্ষের জানালার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ছুটে গেল ?"

অরুণা কক্ষের বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া কহিল, "কৈ কেউ ত নেই বাবা ?"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু বিদায় লইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অরুণা যখন তাহার পিতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন তাহার ননদ হেমাঙ্গিনী জানালার ছিদ্র দিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। হেমাঙ্গিনী অরুণার সমবয়স্কা। হৈমবতীর অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অজয় ও হেমাঙ্গিনী ব্যতীত অপরগুলি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। হেমাঙ্গিনী মাতার আদরের কন্যা; রতনপুরের জমিদারদের বাটীতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার স্বামী আনন্দমোহন কলিকাতার বাটীতেই বৎসরের অধিকাংশ কাল কাটাইত। হেমাঙ্গিনী স্বামীর নিকট কলিকাতার বাটীতেই থাকিত এবং সেই জন্য তাহার মধ্যে মধ্যে মাতার নিকট আসিয়া থাকিবার সুবিধা হইত। শাশুড়ী না থাকাতে এবং ননন্দারা তাহাদের স্ব স্ব শ্বশুর গৃহে—বিদেশে বাস করায়, হেমাঙ্গিনীকে কখনও শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ভোগ করিতে হয় নাই। সে গঞ্জনার যে কি ক্লেশ, সে বিষয়ে নিজে ভুক্তভোগী না হওয়ায়, অরুণাকে মাতার নিকট লাঞ্ছিত করিতে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা বা কষ্ট বোধ হইত না, প্রত্যুত সে কার্য্যে সে সময়ে সময়ে যথেষ্ট আমোদ পাইত।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু কন্যার নিকট বিদায় লইয়া বাটীর বাহির হইতেই হেমাঙ্গিনী তাহার মাতার কাছে গিয়া বলিল, "তুমি ত এখানে বসে মালা জপ্‌ছ—ওদিকে তোমার বৌঠাকরুণ যে বাপের সঙ্গে ঘরভাঙ্গবার পরামর্শ আঁটছেন—তার খবর রাখ্‌ছ ?"

হৈমবতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন—হয়েছে কি ?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "বাপ এসে মেয়েকে হুকুম দিয়ে গেল জামাইকে বলে গুরুমশায়কে ছাড়িয়ে দিতে। যদি তুমি রাজি না হও ত জোর করে ছাড়িয়ে দেবে—তোমার বাপের বাড়ীর লোক রাখতে দেবে না। ছেলে ত দাদার—দাদা যদি ছাড়িয়ে দেয়, তুমি তাতে কথা কইবার কে ?"

হৈমবতী কহিলেন, "হুঁ—এত বড় বুকের পাটা ! আমার বাড়ীতে বসে আমারই সর্ব্বনাশ করবার ফন্দী আঁটছে—'যার শীল তার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' ! দাড়াও ত ঘর জ্বালানির লাগানি ভাঙ্গানি বের করছি। কর্ত্তা যেতে না যেতে, মিন্‌সে, ঝি জামাইকে বশ করে, আমাকে ভিটে ছাড়া করবার যোগাড়ে আছে ! এইবার এলে হতচ্ছাড়া মিন্‌সেকে এমন গোটা কত কাটা কাটা কথা শুনিয়ে দেবো যা তার বাপের জন্মে কখনো শোনেনি। চল্ ত যাই একবার মুখবুজুনির কাছে।" এই কথা বলিয়া হৈমবতী তাহার পুত্রবধূর কক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হ্যালা অ হাড়-হাবাতে ছোট লোকের ঘরের মেয়ে, বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলে ভাঙ্গিয়ে আমাকে ভিটেছাড়া করবার ফন্দী পাকাচ্ছ ? আমাকে তাড়াবি ? সাবধান করে দিচ্ছি ফের যদি আমার সংসারের কোন কথা নিয়ে গুল-তোন্ পাকাবি—ত তোকে কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করে দেবো—দেখি তোর বাপ খুড়ো জ্যাঠা যে যেখানে আছে এসে কি কর্‌তে পারে ?"

হৈমবতী আসিবার পূর্ব্বেই অজয় আসিয়া অরুণার মুখে প্রাণকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা শুনিতেছিল। অজয় যে তৎকালে সেই কক্ষে ছিল তাহা হৈমবতী বা হেমাঙ্গিনী জানিতে পারে নাই। মাতাকে অকারণে অরুণার প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিতে শুনিয়া অজয় গৃহের বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে হৈমবতীকে বলিল, "কেন মিছিমিছি ওকে বক্‌ছ মা—ওসব কথা ত কিছু হয় নি ?"

হৈমবতী অধিকতর রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হয়নি ? হেমা স্বকর্ণে শুনে গেছে।"

হেমাঙ্গিনী অজয়কে দেখিয়া অন্তরালে গিয়া দাড়াইয়াছিল।

অজয় কহিল, "হেমার ওরকম করে আড়াল থেকে শোনা কি ভাল ? আর এই রকম যা' তা' মিছে করে লাগিয়ে, ওদের বকুনি খাইয়ে, কি যে ওর লাভ হয় তাও ত বুঝ্‌তে পারি না।"

হৈমবতী কহিলেন, "তা' বুঝ্‌তে পার্‌বি কেন? তোর মাথার মণি মুখবুজুনি যা বলেছে সেই কথাটাই বেদবাক্যি আর হেমা যা বল্‌ছে সে সব মিথ্যে—না?"

অজয় ধীরভাবেই উত্তর দিল, "মিথ্যে কথাই বলেছে মা—গুরুমশায়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই, ওর কাছে থাকলে সনৎএর স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে, মিথ্যেকথা, চুরী, গালাগাল এই সব শিখ্‌বে তাই তাকে ছাড়িয়ে দেবার কথা বলে গেছেন।"

হৈমবতী উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "গুরুমশায় তার খানা-বাড়ীর চাকর—না বাড়ীর কর্ত্তা তার জামাই—তাই আমাকে ছেটে ফেলে জামাইকে দিয়ে গুরুমশায়কে তাড়াবার মতলব করছে? তাড়াক্ দিকি গুরুমশায়কে—কে তাড়ায় দেখি? শ্বশুর বলেছে গুরুমশায় মন্দ ও অমনি গুরুমশায় মন্দ হয়ে গেল—'ও কাণা সাপ রে! কি চক্কোর বাপ্‌রে!!'—যখন নিজে রোজকার করবি তখন যা ইচ্ছে তা করিস্, এখন আমি যা বল্‌বো তা শুন্‌তে হবে।"

অজয় কহিল, "এ যে তোমার অন্যায় কথা মা! গুরু-মশায় কুশিক্ষা দিচ্ছে, আর ওকে রাখ্‌তে হবে।"

হৈমবতী চীৎকার করিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ—হবে। ভাল হ'ক মন্দ হ'ক আমি যা বল্‌বো তা ঘাড় হেঁট করে শুন্‌তে হ'বে। কার পয়সায় খাচ্ছিস্ পরছিস্ তা জানিস? সব এই দাসী বাঁদীর বাপের—সেটা মনে থাকে যেন। এক পয়সা রোজগার করবার

মুরদ নেই উনি আবার আমার ওপর কত্তাম ফলাতে এসেছেন—'বিষ নেই তার কুলো পানা চক্কোর।' লজ্জাও করে না—ঘরে বসে বসে খাচ্ছেন আর ছোটলোকের মেয়ের লাগানি ভাঙ্গানি শুনে আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে কোঁদল করতে এসেছেন! তোকে আর কি বল্‌বো—তোকে ধিক্!"

অজয় আর কোনও কথা না বলিয়া অধোবদনে বহির্বাটীতে প্রস্থান করিল। ক্ষোভে ও লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল।

অরুণা গৃহের মধ্যে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। তাহাব নিকট হইতে ভর্ৎসনা-বাক্যেব কোনও উত্তর না পাইয়া হৈমবতী সেস্থান ত্যাগ করিতে ছিলেন; এমন সময়, অজয় বহির্বাটীতে প্রস্থান করিতেই, হেমাঙ্গিনী অন্তরাল হইতে আসিয়া, অরুণার গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া গিয়া মাতাকে বলিল, "শুনলে ত দাদাকে সাতখানা করে লাগিয়ে আমাকে কি বকুনিটা খাওয়ালে? এখন আবার ঢং করে কান্না হচ্ছে—পান্‌সে চোখে জল ত আর আটকায় না? মনে করে কাঁদলেই বুঝি জিত হ'লো। তোমার ঐ বউটিকে নিয়ে তোমাকে এরপরে হাড়ে নাড়ে জ্বল্‌তে হ'বে—তা ব'লে দিচ্ছি।"

হৈমবতী কহিলেন, "চল্ চল্—দেমাকে সাড়া অবধি দেয় না? এর ওপর বাবুর যদি রোজগার থাকৃত তা হ'লে আর গিন্নীর মাটিতে পা পড়্‌ত না।"

হৈমবতী ও হেমাঙ্গিনী চলিয়া যাইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া অরুণার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভবকিঙ্করের মৃত্যুর পর বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্ত অসহ্য না হইলে হৈমবতীর কোন কথাতেই কথা কহিতেন না—অধিকাংশ সময় ত্রিতলে ঠাকুর ঘরে বসিয়া নারায়ণের নিত্যসেবার আয়োজন করিতেন ও অবশিষ্টকাল আহ্নিক পূজায় অতিবাহিত করিতেন। হৈমবতীর কণ্ঠস্বর সেদিন অন্য দিন অপেক্ষা উচ্চতব পরতে উঠিয়াছিল বলিয়া, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই—দ্বিতলে নামিয়া আসিয়া অন্তরাল হইতে মাতাপুত্রের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন। এক্ষণে অরুণাব কাছে আসিয়া তিনি নিজ বসনাঞ্চল দিয়া সস্নেহে অরুণাব অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন, "কেঁদ না মা—কেঁদে আর কি করবে বল? যেমন কপাল করে এসেছিলে—এমন ভাল ঘরে বরে পড়েও এক দিনের তরে মনের সুখ পেলে না।"

অরুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমাকে যা বলেন বলুন গে—আমার জন্যে শুধু শুধু ওঁকে কি বলাটা বল্লেন তা শুনেছেন ত?"

হৈমবতী কহিলেন, "শুনেছি মা—সব শুনেছি। অজয় আমার একালেব মত ছেলে নয় তাই, নইলে বেটাছেলে কি দিন রাত্তির ওরকম কথা সইতে পারে? আমাদেরই শুন্‌লে এক এক সময় মনে হয় এ বাড়ী থেকে যেখানে দু চোক যায় বেরিয়ে গেলেই যেন হাড় জুড়োয়। বাছার আমার খুব সহ্য তা বলতে

হ'বে। আর সেই ভাইএর বোন হয়ে হেমাটা কি রকম হয়ে উঠ্‌ল তাই ভাবি। ভাগ্যে শ্বাশুড়ী ননদকে নিয়ে ঘরকর্‌তে হ'ল না—তা হলে ও মেয়ে যে কি কর্‌ত তা বল্‌তে পারিনে। এই যে এত লাগালাগি কর্‌ছে, আড়ি পেতে শুনে তিলকে তাল কর্‌ছে, তা শাসন করা চুলোয় যা'ক্—মা আবার ঐ মেয়ের হয়ে ঝগড়া করে!"

হৈমবতীর সঙ্গে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী পশ্চাৎ ফিরিয়া যেমন দেখিতে পাইল, বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া অরুণার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, অমনি হেমাঙ্গিনী মাতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ত্বরিত-পদে আসিয়া অরুণার কক্ষের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা শুনিতেছিল।

এক্ষণে সে গর্জ্জন করিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া হাত মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "আমি শ্বশুর বাড়ী ঘর করতে পারতুম্ কি না পারতুম তা নিয়ে লোকের অত মাথা ব্যথা কেন? আঃ—নিজেরা বড় ভাল কিনা!" এই কথা বলিয়া সে সশব্দ-পদবিক্ষেপে সেস্থান হইতে হৈমবতীর কক্ষে গিয়া তাঁহাকে কহিল, "তুমি এলে বৌদি'কে বকে, আর পিসিমা আমাকে যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছে কেন বল দিকি? আমি না কি শ্বশুরদের ছন্নছাড়া কর্‌ব—তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাব। তুমিও যেমনি পাহাড়ে কুঁদুলে আমিও না কি তার চেয়ে এককাঠি সরেশ। আমি যেমনি বুনো ওল, তোমার জামাইও নাকি তেমনি বাঘা তেঁতুল—

কাঠে কাঠে মিলেছে। আরও যে কত কি বল্‌লে—তা ছাই আমার সব কথা মনেও নেই।"

পুত্রবধূর সম্বন্ধে হেমাঙ্গিনী যাহাই বলিত তাহাই অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হৈমবতীর স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কন্যার যে অসত্য ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা করা অভ্যাস, তাহা হৈমবতীর অজ্ঞাত ছিল না। তজ্জন্য পুত্রবধূ ব্যতীত অপর কাহারও সম্বন্ধে হেমাঙ্গিনী কোনও কথা বলিলে, হৈমবতী তাহা নিঃসন্দেহে সত্যভাবে গ্রহণ করিতেন না। পুত্রকে 'ঘা দিয়া' বলিয়া হৈমবতীর মনে সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ যে একটা উল্লাস আসিয়াছিল, অল্পক্ষণ পরেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল—তাঁহার মনে একটা অবসাদ—হয়ত একটু আত্মগ্লানিও আসিয়াছিল। সেই জন্য কন্যার কথা শুনিয়া তৎকালে বিষ্ণু-প্রিয়ার সহিত কলহ করিতে যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কন্যার উপর বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "যা বাপু, তোর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর শুনতে পারি নি।"

হেমাঙ্গিনী অভিমানের সুরে বলিল, "হ্যাঁ—যারা ঘর ভাঙ্গা-ভাঙ্গি কর্‌ছে তাদের দোষ হলো না—আমিই হলুম যত নষ্টের গোড়া। 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' আমি আছি, আমাকেই সবাই মিলে বল—যত পার বল—মনের সাধে বল।" এই কথা বলিয়া হেমাঙ্গিনী চক্ষু মুছিল।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া মাতার কাছে

আসিয়াছিল। হৈমবতীও পণ করিয়াছিলেন জামাই নিজে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিয়া না লইয়া যাইলে তিনি কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবেন না। এক্ষণে অভিমানিনী কন্যার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার আশায় কহিলেন, "ঘর শত্তুরেই সংসারটা ভাঙ্‌লে—তা কি কর্‌বো বল? এমন এক চোখো পিসিও কোথাও দেখিনি বাপু! ওদের সব ভাল আর তোর আমার সবই মন্দ—'যাকে না দেখ্‌তে পারি তার চলন বাঁকা।' চার কালটা এমনি করে জ্বালিয়ে আস্‌ছে, ওসব ঘর-জ্বালানী পর-ভালানীদের কি আর বল্‌ব বল?"

মাতার মন্তব্য শুনিয়া কন্যা আশ্বস্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সে দিন রাত্রে অজয় যখন শয়ন করিতে আসিল, তখন তাহার মুখে কি যেন একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া অরুণা চমকিয়া উঠিল। অপর দিন মাতার নিকট অরুণাকে অন্যায়রূপে বিনা দোষে লাঞ্ছিত হইতে দেখিলে অজয় নিজেই সস্নেহ বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিত—আদর সোহাগে তাহার মনের ভার লাঘব করিয়া দিবার চেষ্টা করিত। সেদিন কিন্তু অজয় কোনও কথা কহিল না—অরুণাকে প্রীত করিবার জন্য কোনও সান্ত্বনা দিল না। গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল—শয়ন করিল না।

অরুণা শয্যাগ্রহণ করিলে অজয় উঠিয়া আলমারির মাথায় একটী গ্লাডষ্টোন ব্যাগ্ ছিল সেটীকে পাড়িল। এবং আলমারি ও দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে নিজের ব্যবহার্য্য কাপড়, জামা এবং নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিয়া সেই গ্লাডষ্টোন ব্যাগের মধ্যে পূরিতে লাগিল। অরুণা কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অজয়ের সেই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া, ধীরে ধীরে অজয়ের নিকটে আসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওসব হচ্ছে কি ?"

সেই কয়টী কথাতে অরুণার হৃদয়ের গভীর ভালবাসা, আবেগ ও উৎকণ্ঠা যুগপৎ প্রকট হইয়া উঠিল। অজয় তাহার দিকে মুখ না তুলিয়াই গাঢ় স্বরে উত্তর দিল, "আমি আর এখানে তিষ্ঠতে পার্‌ছি না—পশ্চিমে যাব।"

অরুণা উদ্বেগ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?—পশ্চিমে? সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে?"

অজয় কহিল, "কোন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ্‌ব। এখানে এতদিন গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়িয়েছি—সবাই বড়লোকের ছেলে ব'লে জানে। এখানে সামান্য মাইনের কাজ কর্‌লে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে—আমারও বাধ বাধ ঠেক্‌বে—লজ্জা কর্‌বে। কিন্তু বিদেশে অচেনা জায়গায় গেলে সে সব লজ্জা টজ্জার ভয় থাক্‌বে না। ছেলে পড়িয়ে হো'ক—কাগজে লিখে হো'ক—যা করে হো'ক কিছু রোজগার কর্‌তে পার্‌লেই এর চেয়ে মনের শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌ব।"

অরুণা ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, "তুমি যেন পারলে—আমাব দশা কি হবে?"

অজয় কহিল, "তোমাকে নিয়ে যা'ব। সনৎ এখানেই থাকবে—ওকে আর কষ্ট দেব কেন? ও বড়লোকের ছেলের মতনই মানুষ হচ্ছে—থাকুক্ ও মার কাছেই থাকুক্। কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে গাছতলাও ভাল—আর তুমি যদি

কাছে থাক—তা হলে আমার ত কোন কষ্টই কষ্ট ব'লে বোধ হ'বে না।"

অরুণা ধীরে ধীরে কহিল, "এখন মনের কষ্টে তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু বেশ বুঝতে পার্‌ছি—তুমি সে কষ্ট সইতে পার্‌বে না! তুমি এতকাল বড়মানুষের ছেলের মত রাজভোগে থেকে হঠাৎ কি দীন দুঃখীর মত সংসারের দুঃখু ঝঞ্ঝাট—অভাব অনটন সইতে পারবে? আর শুধু শুধু সে কষ্টই বা তুমি ভোগ কর্‌তে যা'বে কেন? আমার জন্যেই ত বকুনি খাও—তা আমার ও সব সয়ে গেছে। তবে এক একবার যখন নেহাৎ সামলাতে না পারি—তখন হাসি মুখে সেটা উড়িয়ে দিতে পারি নে। তা তুমি সে সব কথায় কাণ দিওনা—এবার থেকে দেখ্‌বে, মা যাই বলুন—আমি কাঁদবও না আর তুমি আমার মুখভারও দেখ্‌তে পা'বে না।"

অজয় বলিল, "তা তুমি পার্‌বে না অরুণা। মার ত অন্য শ্বাশুড়ীর মত বলা নয়—সে বলা যে হাড়ে হাড়ে গিয়ে বেঁধে—রক্ত মানুষের শরীরে সে বলা—তুমি কেন অরুণা, অতিবড় সহিষ্ণু দেবতাও সইতে পারে না।"

অরুণা উত্তর দিল, "তবে আমাকে না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—আমি সেইখানে গিয়ে থাকি। আমার জন্যে তুমি ঘর বাড়ী ছেড়ে যাবে কেন?"

অজয়, অরুণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, কহিল, "তুমি সেখানে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে ?"

অরুণা আনতবদনে পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া গৃহতল খননের বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "কেন পার্‌ব না—গরিবের মেয়ে আমাদের ত আর খাবার পরবার কষ্ট গায়ে লাগ্‌বে না—সে ত সওয়া আছে।"

অজয় পুনরায় অরুণার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "তবে আগে ত অনেকবার তোমাকে রেখে আসবার কথা বলেছিলুম—তখন যেতে চাওনি কেন ? দিনরাত্রি মার গঞ্জনা খেয়ে চোখের জলে ভেসেছ—তবু যাওনি কেন ?"

অরুণা ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "মা বাপের অবাধ্য হয়ে তুমি যদি আমাকে তখন রেখে আস্‌তে, তা হলে লোকে তোমায় কি বলত ? আর আমার নিজের কষ্টের জন্যে ত এখন যেতে চাইছি না।"

অজয় কহিল, "তা বুঝেছি—কিন্তু তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ছেড়ে থাক্‌তে হলে আমার যে কষ্ট হবে, তার সঙ্গে তুলনায় আমার বিদেশে খেটে খাওয়ায় কষ্ট যে কিছুই নয় —তোমাকে ছেড়ে যে আমি থাক্‌তেই পারিনা—সেটা ভেবেছ কি ?"

অরুণা সে প্রশ্নের উত্তর দিল না, সে একবার মাত্র অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে দৃষ্টির মৌন তিরস্কার অজয়ের

হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিল। অজয় জানিত যে তাহাকে দেখিতে পাইবে না—তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়াই অরুণা এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও পিত্রালয়ে যাইতে চাহে নাই। অজয় করুণার্দ্র হইয়া অরুণাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, "তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না বলেইত এখান থেকে যাচ্ছি। একটা কাজ জুঠ্‌লেই তোমাকে নিয়ে যা'ব। তবে তেমন বেশী মাইনের কাজ ত প্রথমেই জুঠ্‌বে না—তোমাকে হয়ত, যে সব কাজ করনা সেই সব কাজ কর্‌তে হ'বে—হয়ত রান্নাবান্না কর্‌তে হবে—সেই এক ভাবনা।"

অরুণা ম্লান মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "হ্যাঁ সেইটেই মস্ত ভাবনার কথা বটে! আমি যেন কখনো রাঁধিনি, কাজ কর্ম্মও করিনি? গরিবের মেয়ে—এখানে এসে রান্নাবান্না কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পাই না বলেই বরং কষ্ট। সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না গো মশাই—তোমার নিজের যে কি কষ্ট হবে সেটা তুমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—সেই ভাবনাই আমি ভাব্‌ছি।

অজয় কহিল, "কথাটার গোড়াতেই তোমার ভুল—প্রফেসারী কি আর কোন কাজ করে খেটে খেতে হলেই যে আমার কষ্ট হ'বে ঠিক ক'রে রেখেছ—ঐ টাই তোমার ভুল। নিজের রোজগারের টাকায় জীবনধারণ করার যে একটা সুখ আছে, আমি এখন কর্ম্মী পুরুষের সেই সুখ খুঁজতে

চলেছি। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির দোহাই দিয়ে লোকে যে কি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত টাকা ভোগ করে—আবার সে জন্যে গৌরব করে—গর্ব্ব করে, তা' বুঝ্‌তে পারি না। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর বা পিতৃ-পিতামহের টাকা ভোগ করতে পারে, কিন্তু পুরুষ হয়ে পরের টাকায় জীবন ধারণ করা যে লজ্জার কথা—নিজের পুরুষকারকে খাটো করা যে নিতান্ত কাপুরুষের—অকর্ম্মণ্যের কথা, সেটা এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মা আমাকে সেই কথাটা বোঝ্‌বার উপায় করে দিয়ে ভালই করেছেন। আমি এখন যে পথে যেতে চাইছি, সে পথে গেলে যত কষ্টই আমার হো'ক—সেটা কষ্ট বলে বোধ হবে না—তা'তে আমি সুখেই থাক্‌ব—তা ঠিক জেনো।"

এই কথা গুলি বলিতে বলিতে উত্তেজনা বশত অজয়ের মলিন ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে যে একটা অপূর্ব্ব প্রভা আসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অরুণারও করুণনয়নে একটা প্রশংসা ও প্রীতির জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তাহার ব্যথিত-হৃদয়ে যে একটা উদ্বেগের ভাব আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিল। অরুণাকে মৌন দেখিয়া অজয় বুঝিতে পারিল, সে তাহার মনের কথা বুঝিয়াছে। অজয় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "আমার আর একটা ভাবনা হচ্ছে এই যে, আমি গেলে, তোমারই মন্ত্রণায় আমি বিদেশে

গেছি মনে করে মা হয়ত তোমাকে আরো বেশী করে গঞ্জনা দিতে থাকবেন। আমি কাছে থাক্‌লে তবু তোমার কতকটা ভরসা থাকৃত। আমি গেলে তুমি নিতান্ত অসহায় হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু আবার ভাবছি, সে কষ্ট ত আর বেশী দিন পেতে হবে না—শীগ্‌গির এসে তোমাকে নিয়ে যা'ব—তাহ'লেই সব চুকে যাবে।"

অরুণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে কি ব'লে যাবে না না'কি ?"

অজয় কহিল, "হাঁ অরুণা—ব'লে যা'ব না—ব'লে গেলে তিনি রাজি হবেন না—শেষে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি একটা ঝগড়া করে যেতে হ'বে ? তার চেয়ে না ব'লে যাওয়াই ভাল। তোমার কাছে ঠিকানা দিয়ে যেতেও পারব না—কেন না কোথায় যা'ব তা'র ত ঠিক নেই। আর ঠিকানা দিয়ে গেলে সেখানে লোক পাঠিয়ে মা আমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে হয়ত একটা গোলযোগ বাঁধাবেন। একেবারে, কাযের কোথাও ঠিক হ'লে তোমাকে ঠিকানাও লিখে পাঠাব আর সঙ্গে সঙ্গে এসে নিয়েও যাব। পিসিমাকেও ব'লে যেতে পারব না—তিনিও তাহ'লে কান্নাকাটি করে গোলযোগ বাঁধাতে পারেন। তবে তোমার ওপর যা'তে কোনো দোষ না পড়ে তা'র উপায় আমি করে যা'ব। আমি মাকে ডাকে চিঠি দিয়ে যা'ব। আমি চলে গেলে তারপর চিঠি এসে পৌছবে। যদি কায কর্ম্ম শীগ্‌গির

না জোটে, তা হ'লেই তোমাকে খবর দেব—নইলে একেবারে কায পেলে তবে লিখ্‌ব।"

সে রাত্রে উভয়েরই নিদ্রা হইল না। অরুণার যেন শয্যাকণ্টক হইল—সে এক একবার মনের আবেগে মস্তকের উপাধান অশ্রুসিক্ত করিতে লাগিল। মধ্যরাত্রে একবার অজয়ের মনে তাহার পুত্রকে দেখিয়া যাইবার সাধ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল, যে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। কিন্তু সনৎ তাহার পিতামহীর কাছে শয়ন করিত—এতরাত্রে সেখানে যাইলে হৈমবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে এবং তিনি তাহার মনের কথা সন্দেহ করিতে পারেন—অজয়ের সেখানে যাইতে সাহস হইল না। তাহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া অরুণা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এর মধ্যে কি ভোর হ'ল না কি ?"

অজয় সস্নেহে কহিল, "না—এখনো রাত আছে—তুমি ঘুমোও।" কিন্তু অজয় বুঝিতে পারিল অরুণা বিনিদ্র-নয়নেই শয়ন করিয়া রহিল।

অজয় তাহার শয়ন কক্ষের ক্লক ঘড়িতে রাত্রি ৪ টার সময় বাজিবার এলাম্‌ দিয়া রাখিয়াছিল। ঘড়ি বাজিতে আরম্ভ হইতেই পাছে বাড়ীর অপর কাহারো নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে অজয় ঘটিকাযন্ত্রের বাদ্য বন্ধ করিয়া দিল।

অরুণাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিল। অজয় পূর্ব্বদিন

তাহার ঘড়ি ও চেন বিক্রয় করিয়া প্রায় পাঁচ শত টাকা আনিয়া দেরাজে রাখিয়াছিল। কাপড় জামা পরিধান করিয়া অজয় সেই টাকা বাহির করিয়া লইল। অরুণা নীরবে উঠিয়া তাহার গহণার বাক্স খুলিয়া অজয়কে বলিল, "যদি টাকার দরকার হয়— এই থেকে কিছু নিয়ে যাওনা ?"

অজয় কহিল, "না না—টাকা যা নিয়ে যাচ্ছি তাতেই ঢের হবে। সেখানে ত আর বাবুয়ানা করব না ? সামান্য লোকের মতই থাকব।"

পতি-পত্নীতে আর কোনও কথা হইল না। উভয়েই উভয়ের চিন্তার গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল। সহসা ঘড়ির দিকে চাহিয়া অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ্‌টা উঠাইয়া লইয়া নীরবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; তখনও অরুণা শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়াছিল। অজয় যখন মুক্ত ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন অরুণার সংজ্ঞা হইল। সে উদ্‌ভ্রান্তার মত গৃহের বাহিরে ছুটিয়া গেল এবং অজয়কে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। অজয় কম্পিত হস্তে ব্যাগ্‌ নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া তুলিল। তাহার আবেগ-স্পন্দিত বক্ষের উপর অরুণা মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। অজয় ধীরে ধীরে অপনাকে অরুণার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত

করিয়া নিশান্তের পরিম্লান চন্দ্রালোকে অরুণার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে ক্ষণকাল সস্নেহে চাহিয়া রহিল। পরে ভগ্নস্বরে "ছিঃ কেঁদোনা" বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় ব্যাগ্‌টা হস্তে তুলিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দপদ-বিক্ষেপে ছাদ হইতে নামিয়া, খিড়কীর দ্বার দিয়া রাজপথে বাহির হইল। তখনও পথে গ্যাসালোক জ্বলিতেছিল।

অরুণা স্খলিত-চরণে গৃহে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই অজয় মনে মনে তাহার ভবিষ্যতের পন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে প্রথমে বারাণসীতে গিয়া সিক্‌রোলের নিকট জনৈক হিন্দুস্থানীর বাটীতে একটী ঘর ভাড়া লইল এবং সেই ঠিকানা দিয়া ভাগলপুর হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর পর্য্যন্ত বেহার, উত্তর-পশ্চিম (তখনও যুক্ত-প্রদেশ নাম হয় নাই) ও পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ইতিহাসের বা ইংরাজির অধ্যাপক বা প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করিয়া উত্তরের মাশুল দিয়া টেলিগ্রাফ্ করিল। তিন চারি দিনের মধ্যে অধিকাংশ স্কুল হইতে তারে উত্তর আসিল কোন অধ্যাপকের বা উচ্চশিক্ষকের পদ খালি নাই। হতাশ হইয়া অজয় মনে করিল সে নিজে গিয়া উক্ত স্থান সমূহের রাজা বা ধনবান জমিদারগণের নিকট তাঁহাদের পুত্রের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কিনা অনুসন্ধান করিবে, তাহা হইলেই হয়ত কোনও না কোনও রাজবাটীতে তাহার ভাল চাকরী মিলিয়া যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমেই সে রামনগরে কাশী-নরেশের বাটীতে অনুসন্ধান লইল। কিন্তু সেখানে যাইয়া শুনিল

রাজবাটীতে তৎকালে কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন নাই। নৈরাশ্য-পীড়িত অন্তরে গঙ্গা পার হইয়া, বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের মানসে অসি-ঘাটে নামিয়া, অজয় গালে হাত দিয়া বসিয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে তাহার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় সে দেখিল একজন প্রাচীন ব্যক্তি একটী ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত সেই ঘাটে বেড়াইত আসিল। অজয়কে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই বৃদ্ধব্যক্তি তাহার প্রতি সহানুভূতি সূচক দুই একটী প্রশ্ন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল। বৃদ্ধের সদয় ব্যবহারে অজয় তাহাকে তাহার তৎকালীন চিন্তার কারণ জানাইল। বৃদ্ধ বলিল তাহার নাম বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য, বারাণসীতে প্রবাসী একজন বাঙ্গালী জমিদারের বাটীতে সে সরকারের কর্ম্ম করে—বাবুর নাম পূর্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী—ফরিদপুর অঞ্চলে বাটী। তাহার সঙ্গের বালকটী পূর্ণেন্দু বাবুরই পুত্র—নাম ফণীন্দ্র নারায়ণ! বাবু পুত্রকে স্কুলে দেন নাই—তাহার জন্য দিবারাত্র বাটীতে থাকিবে এরূপ একজন ভাল শিক্ষক খুঁজিতেছেন—একশত টাকা মাসিক বেতন দিবেন। অজয় যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে বৃন্দাবন অজয়কে সেই কর্ম্মটী যোগাড় করিয়া দিতে পারে। অজয় সেই সংবাদ শুনিয়া সেই নৈরাশ্যের সময় তাহাকে দৈব প্রেরিত বলিয়া মনে করিল এবং অকপটে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বৃন্দাবনের প্রস্তাবে সম্মত হইল। বেতন অশানুরূপ না হইলেও, অজয় ভাবিল, আপাততঃ

সেই কর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে সত্বর অরুণাকে কাশীতে আনিতে পারিবে। বৃন্দাবন তাহাকে পূর্ণেন্দু বাবুর ঠিকানা দিয়া এবং পরদিন দেখা করিতে বলিয়া বিদায় লইল।

পরদিন অজয় পূর্ণেন্দুবাবুর সন্ধানে বাহির হইয়া দেখিল কাশীর প্রান্তভাগে একটী বাগান-বাটীতে পূর্ণেন্দুবাবু বাস করেন। পল্লীটী বিরলবসতি। অজয় ভাবিল, ভালই হইল—সেখানে থাকিলে কোনও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃন্দাবনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই সে কহিল, "বাবু রাজি হয়েছেন—কাল থেকে কাজে লেগে যা'ন।" পরদিবস হইতে অজয় পূর্ণেন্দুবাবুর বাটীতে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

প্রথমদিন পাঠ করাইতে বসিয়াই অজয় ফণীন্দ্রের স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইল। ফণীন্দ্রের একটী বানান ভুল ধরিতেই ফণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, "না—ঠিকই ত বলেছিলুম—আপনি শুনতে পান নি।" কোনও কথার অর্থের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেই ফণীন্দ্র—"কৈ ডিক্সনারী দেখি?" বলিয়া শিক্ষকের ভ্রম হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লইল; পাঠের ব্যাখ্যার ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, শিক্ষকের অর্থ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ না করিয়া, ফণীন্দ্র বলিল, "না—আমি যা' বলেছি সে মানেও হয়—গণেশ বাবু বলে দিয়ে গেছেন।" গণেশপ্রসাদ, অজয় আসিবার পূর্ব্বে, ফণীন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। অঙ্ক কসিতে দিলে ফণীন্দ্র বলিল

"আপনিই কস্থন না—আমি দেখে নিচ্ছি।" অজয় সেদিন ফণীন্দ্রের সকল আবদারই সহ্য করিল, কিন্তু পরদিন ফণীন্দ্রকে বলিল, "আগে এই অঙ্ক ক'টা কস—আমি কস্‌লে হবে না, তুমি কস—না পার্‌লে আমি বুঝিয়ে দেব।" ফণীন্দ্র বলিল, "ওরকম আমার অভ্যেস নেই।" অজয় বলিল, "অভ্যাস করতে হবে—অভ্যাস কি আর একেবারে হয়?" ফণীন্দ্র যখন দেখিল শিক্ষক সহজে হাল ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহে, তখন সে কিয়ৎক্ষণ খাতা লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া বলিল, "আমার মাথা ধরেছে মাষ্টার মশায়—আজ আর পড়্‌ব না।"

পরদিন প্রভাতে পড়াইতে বসিবার কিয়ৎক্ষণ পরে স্বয়ং পূর্ণেন্দুবাবু সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ বেশ মসৃণ, উদর নিটোল, মস্তকে টেরী এবং গোঁফে কলপ। তিনি পান চিবাইতে চিবাইতে একটী বাঁধা হুকা হাতে করিয়া আসিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, এবং কোনও গৌরচন্দ্রিকা না করিয়াই কহিলেন, "ওহে মাষ্টার! বলি—তোমার গিয়ে ইয়ে—তুমি ও কি অনাছিষ্টি রকম পড়াচ্ছ? ছেলেকে অত খাটাচ্ছ কেন—ওর কাল মাথা ধরে গিয়েছিল শুনলুম। ছেলেই যদি অত খাট্‌বে ত তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখবার দরকার কি? আমার কাছে—তোমার গিয়ে ইয়ে—স্পষ্ট কথা। আমার কাছে ফাঁকি টাকি চল্‌বে না—আমার হিন্দু স্কুলে এডুকেশন্‌!"

অজয় কহিল, "আজ্ঞে কাল ত ফণীকে খাটান হয় নি। অঙ্ক দিতেই ও বল্লে মাথা ধরেছে—তাই আর পড়েনি।"

পূর্ণেন্দুবাবু হুঁকায় শোষটান দিয়া কহিলেন, "কি জান মাষ্টার—তোমরা ঐ এম্-এ পাসই কর আর যাই কর—তোমার গিয়ে ইয়ে—ইংরিজীতে একটা বচন আছে—"School-masters are fools."—অর্থাৎ কিনা মাষ্টারেরা হচ্ছে আস্ত গাধা। ফণীন্দ্রকে ত আর এর পরে তোমাদের মতন ছাতা ঘাড়ে করে টো টো কোম্পাণীর স্কুলে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে হবে না। অঙ্ক কসা নিয়ে ওকে অত পেড়া পীড়ি কেন? ও কি মাছিমারা কেরাণী হয়ে কলম পিস্‌বে, না গণ্ডায় এণ্ডা দিয়ে হিসেব মেলাবে? ওকে—তোমার গিয়ে ইয়ে—হাকিম টাকিমের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে—লাট সাহেবের দরবারে সওয়াল জবাব করতে হবে। যা'তে ইংরিজীটা ভাল ক'রে কেতাদোরস্ত রকমে বল্‌তে কইতে পারে, সেই চেষ্টা দেখ। যাতে ওকে মাথা ঘামাতে হয় এমন কিছু কর্‌তে বোলোনা।"

অজয় কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—তা কর্‌তে হবে বৈকি! তবে কিনা নিজে না খাট্‌লে—কিছুই হবার যো নেই—ইংরেজী শেখাও হয় না—নিজের চেষ্টা আগে দরকার।"

পূর্ণেন্দুবাবু কিছু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "আরে কি বল হে তুমি মাষ্টার! ইংরিজী শিখে শিখে আমরা—তোমার গিয়ে ইয়ে—পেকে ঝুনো হয়ে গেলাম—আজ কিনা তুমি আমাকে

ইংরিজী শেখা নিয়ে লেক্‌চার দিতে এলে? ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব একদিন আমার ইংরিজী শুনে বলে ছিলেন, "I see Purnendu Babu, English is your mother tongue!"—অর্থাৎ কিনা—আমি দেখছি পূর্ণেন্দুবাবু, ইংরিজী হচ্ছে—তোমার গিয়ে ইয়ে—তোমার মাতৃভাষা।"

অজয় সবিস্ময়ে কহিল "হ্যালিডে সাহেব! সে যে অনেক দিনের কথা—আপনার তত বয়স বলে ত বোধ হয় না?"

পূর্ণেন্দু বাবু কহিলেন, "না—না হ্যালিডে কেন হবে হে— ঐ যে—তোমার গিয়ে ইয়ে—ইডেন্ সাহেব।"

তৎপরদিন পূর্ণেন্দুবাবু অজয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "মাষ্টার একটা কাজ কর দেখি—মন পাঁচেক ঘোড়ার দানা কিনে আন গে দেখি?"

অজয় এপর্য্যন্ত নিজে কোনও সংসারিক দ্রব্য ক্রয় করে নাই, অথচ নূতন মনিবের কথা প্রত্যাখ্যান করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। অগত্যা সে ঘোড়ার দানা কিনিতে গিয়া কিছু ঠকিয়া আসিল।

পূর্ণেন্দুবাবু দানার দর শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও।" অজয় পশ্চাৎ ফিরিতেই পূর্ণেন্দুবাবু তাঁহার একজন পারিষদকে কহিলেন, "শুন্‌লে ভট্‌চাজ্—সহিস ৩৶০ মন এনে ছিল বলে বাবুকে আন্‌তে দিলুম—বাবু নিয়ে এলেন ৩৷৶০ মন—সহিসের চেয়ে এককাটী সরেশ। চাকর

বাকরের আর ভদ্দর ইতর নেই—মনিবকে ঠকাতে পেলে কোন শর্ম্মাই ছেড়ে কথা ক'ন না।"

সেই কথা শুনিয়া অজয়ের কর্ণদ্বয় লজ্জায় ও ঘৃণায় লাল হইয়া উঠিল। সে স্খলিত-পদে নামিয়া গিয়া বহির্বাটীর একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, তাহার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার পরদিন বেলা আটটার সময় অজয় পড়াইবার কক্ষে গিয়া তাহার বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছারপোকায় পূর্ণ কাষ্ঠের ভগ্নপ্রায় চেয়ার খানিতে বসিয়া, সম্মুখে ফণীন্দ্রের জন্য সজ্জিত মরক্কো চর্ম্মের গদী বিশিষ্ট মেহগেনী কাষ্ঠের চেয়ার খানির দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া ফণীন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে (ফণীন্দ্রের তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই) এমন সময় উপর হইতে পূর্ণেন্দুবাবু ডাকিলেন, "মাষ্টার—এদিকে এস ত ?"

অজয় উপরের বৈঠকখানা ঘরে গিয়া দেখে একজন লোককে মহাখাতির করিয়া পূর্ণেন্দু বাবু একখানি স্প্রীংএর গদী বিশিষ্ট সোফায় বসাইতেছেন। লোকটীকে দেখিয়াই অজয় চমকিয়া উঠিল। অজয়ের পিতা যখন ফরিদপুরে ডেপুটী ছিলেন, সেই সময় ঐ লোকটী তাঁহার একজন আমলা ছিল। ঘুস লওয়া লইয়া একটা গণ্ডগোল হওয়াতে লোকটীর চাকরী যায়। সেই সময়ে সে একদিন অজয়ের পিতার নিকট, বাসায় আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, চাকরী পুনঃপ্রাপ্তির আশায়

অনেক কাকুতি মিনতি করে। অজয় তখন বালকমাত্র। কিন্তু সে দিনের কথা সুস্পষ্টরূপে অজয়ের মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে লোকটী অজয়কে চিনিতে পারিল না।

পূর্ণেন্দু বাবু কহিলেন, "মাষ্টার এক কাজ করত? চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই ডালিটা দিয়ে এসত? তুমি ইংরিজীতে দুকথা ব'লে, আমার হ'য়ে ভাল ক'রে সলাম টেলাম করে, সাহেবকে সন্তুষ্ট ক'রে আস্‌তে পার্‌বে ব'লে, সরকারকে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠাচ্ছি। হিজ্‌ লর্ডশিপ্‌কে আমার রেস্‌পেক্ট্‌ আর লয়াল্‌টী জানিয়ে ব'লে আস্‌বে যে তিনিই হচ্ছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি—আমাদের মালিক—ফাদার মাদার—যাও।" একজন পরিচারক ডালিটি তুলিয়া লইল, কিন্তু চাটুয্যে মশায়কে পূর্ণেন্দুবাবু যে ছয়টী দ্বারবঙ্গের ল্যাংড়া আম্র দিয়া একটী স্বতন্ত্র ছোট ডালি করিয়া দিয়াছিলেন, বিদায়কালে চাটুয্যেমহাশয় উহা তুলিয়া লইতেই, পূর্ণেন্দু বাবু উহা তাহার হাত হইতে লইয়া অজয়কে দিয়া বলিলেন—"যাও, অমনি এটা হাতে করে নিয়ে যাও—চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিও। এঁরা সব হচ্ছেন হাকিমের ডান হাত বাঁ হাত; এঁদের সুনজরে থাক্‌লে আখেরে ভাল হবে—যাও।" চাটুর্য্যে অগ্রসর হইতেই পরিচারকের সহিত অজয় তাহার অনুগমন করিল। অজয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল—যখন চাকরী করিতে হইবে তখন মান

মর্য্যাদার অভিমান একেবারে ত্যাগ করিবে। কিন্তু শিক্ষকতা করিতে আসিয়া তাহাকে যে ভারবাহী ভৃত্যের কাজ ও হাকিম-সেবার দৌত্য করিতে হইবে, তাহা সে কল্পনায় আনে নাই।

অষ্টম দিবসে অজয়ের চাকরীর সুখ চরমে গিয়া পৌঁছিল; সে দিন অজয় স্নান করিয়া বহির্বাটীতে তাহার খাটিয়ার উপর বসিয়া আহারের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে অন্দর মহলের সম্মুখের ঘরের খড়খড়ির মধ্য হইতে একজন নারী কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, "যা না এইবার নেত্য, মাষ্টার মশায়ের নাওয়া হয়ে গেছে—বাড়ীর ভেতর থেকে ডেকে আন্।"

ক্ষণকাল পরেই পরিচারিকা নৃত্যকালী বাহিরে আসিয়া অজয়কে বলিল, "আসুন মাষ্টার মশায়—বাড়ীর ভেতরে খাবেন আসুন—মা ঠাকরুণ ত আপনাকে এতদিন দেখেননি—মনে করেছিলেন এখানকার হিন্দুস্থানী মাষ্টার এসেছে। আপনি ভদ্দর ঘরের কায়েতের ছেলে জান্‌লে, তিনি আপনাকে বাইরের লোক জনের সঙ্গে এ ক'দিন খেতে দিতেন না। আসুন—আজ থেকে আপনি বাড়ীর ভেতরই খাবেন।"

প্রবাসে আসিয়া নারী হৃদয়ের সেই অযাচিত স্নেহের প্রথম নিদর্শন পাইয়া অজয়ের অন্তর বাটীর গৃহিণীর প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "চল যাচ্ছি, গিন্নিমাকে আমার প্রণাম জানিও।"

অজয় বাটীর ভিতরে আহার করিতে বসিবার কিয়ৎক্ষণ

পরে পূর্ণেন্দু বাবু অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি অজয়কে বাটীর ভিতরে ভোজন করিতে দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। পরক্ষণেই তাঁহার ক্রোধকম্পিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে অন্দরমহল মুখরিত হইয়া উঠিল। তিনি কাহাকে বলিতেছেন, "আমার সঙ্গে কারসাজি—তুমি বেড়াও ডালে ডালে আমি বেড়াই পাতায় পাতায়! কোথা-কার উট্‌কো লোককে বাড়ীর ভেতর ঢোকান হয়েছে? কিছু বলিনি ব'লে আস্পদ্দা বেড়ে গেছে বটে। কি? ভদ্দর ঘরের ছেলে বলে বাড়ীর ভেতর খেতে দিয়েছ?—কেন? সরকার মুহুরীরা ছোট লোক—না? তারা যে বুড়ো তাই ভদ্দর নয়—কেমন? ওসব ন্যাকামী রেখে দাও—ছোঁড়ার চেহারাটা দেখেই আমার খট্‌কা লেগেছিল। হুট্ করে একেবারে বাড়ীর ভেতর এসে ঢুকেছে—কোন দিন এসে দেখবো একেবারে—" তদুত্তরে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"যাও যাও কি ছোট লোকমি কর—তোমার লজ্জা করে না—আমাদের যে লজ্জা করে।" পূর্ণেন্দু বাবুর ব্যঙ্গস্বরে উত্তর হইল—"ওঃ কি আমার নজ্জাবতী নতারে! আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াতে বসেছেন—আবার নাকে কান্না। আজই ওকে বিদেয় ক'রে তবে আমার কাজ!"

অজয় অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িল। সে সরমে, মরমে মরিয়া, এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। বহির্বাটীতে গিয়াই সে

আপনার বস্ত্রাদি ব্যাগে পূরিয়া লইল—এবং নিজেই তৎক্ষণাৎ সেই বাটী হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এমন সময় পূর্ণেন্দু বাবু উপর হইতে হাঁকিলেন—"বৃন্দাবন—মাষ্টারকে বলে দাও আজ থেকে—তোমার গিয়ে ইয়ে—তার জবাব হয়ে গেল।"

অজয় ব্যাগ্‌টা হস্তে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় বৃদ্ধ সরকার বৃন্দাবন দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে বলিল, "এই নিন আট দিনের মাইনে।" অজয় কহিল, "না—ও আর চাইনা—ফিরিয়ে দেবেন।" পরে বৃদ্ধের মুখের করুণার্দ্রভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "না হয় ওটা আপনিই নেবেন।"

বৃদ্ধ দুঃখিত স্বরে কহিল, "আমারই দোষ হয়ে গেছে—এ বাড়ীর সব কথা খুলে বলে নিয়ে এলে আর আজকের এই কাণ্ডটা ঘটত না। গিন্নির কি কোন হাত আছে, যে তাঁর কথা শুনে বাড়ীর ভেতর খেতে গিয়েছিলেন?" পরে অজয়ের সন্নিকটে আসিয়া চুপি চুপি কহিল—"গিন্নি ত বাবুর ঠিক্ পরিবার ন'ন—বাবুর বড় শালী—ওঁকে বিধবা বিয়ে করে এনে—ওঁর বিষয় সম্পত্তি সব হাত করে, দেশে এক ঘরে হবার ভয়ে, বাবু এখানে এসে আছেন। আর বাবুকে সর্ব্বস্ব দিয়ে থুয়ে গিন্নি এখন নাকের জলে চোখের জলে ভাস্‌ছেন। ছেলে ১৪।১৫ বছরের হতে চল্‌ল—তবু ওঁর গঙ্গা নাইবার হুকুম নেই—রাস্তার লোকের দিকে চাইবার—এমন কি চাকরদের সঙ্গে কথা কইবার যো

নেই—বাবুর ও একটা ব্যায়রাম। যাহো'ক আপনাকে এনে ক'দিন মিথ্যে কষ্ট দিলাম।"

বৃদ্ধের সমবেদনায় অজয়ের মনের যাতনার কিয়ৎপরিমানে লাঘব হইল। সে বলিল, "আপনি দুঃখ করবেন না—বোধ হয় ভালর জন্যেই এটা হ'ল। এই প্রথম চাকরীটা আমায় যে অভিজ্ঞতা দিলে, তাতে ভবিষ্যতে আমি সাবধান হ'তে পারব।"

অজয় বিদায় লইয়া পুনরায় তাহার পুরাতন বাসায় গিয়া উঠিল। চাকরী লইতে হইলে যে আত্মসম্মানকে এমন করিয়া পদদলিত করিতে হয়—মনুষ্যত্বকে এত খর্ব্ব করিতে হয়, তাহা অজয়ের ধারণায় আ'সে নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল আর বাঙ্গালী জমিদারের নিকট চাকরী করিবে না। যখন কোনও সরকারী বা সাধারণ বিদ্যালয়ে চাকরী জুটিতেছে না—তখন কোন রাজা বা নবাবের বাটীতে যাহাতে কর্ম্ম পাওয়া যায় তাহারই সে প্রথমে চেষ্টা করিবে। সে স্থির করিল সর্ব্বাগ্রে সে অযোধ্যার মহারাজার নিকট যাইবে - যদি সেখানে অকৃত-কার্য্য হয় তাহা হইলে জয়পুরে ও তৎপরে রাজপুতনার অন্যান্য রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া পরদিনই সে অযোধ্যায় যাত্রা করিল। বারাণসী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অরুণাকে দুইছত্র পত্র লিখিয়া জানাইল—তখনো তাহার মনোমত কর্ম্ম জুঠে নাই—কিন্তু শীঘ্রই যোগাড় করিয়া লইবে এরূপ আশা আছে। স্থায়ী চাকরী

পাইলেই সে পূর্ব্ব কথামত অরুণাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া আসিবে। তাহার গন্তব্যস্থানের স্থিরতা নাই সেই হেতু ঠিকানা দিতে পারিল না। কাশীতে প্রথম কর্ম্মস্থানে সে যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছে সে কথা অরুণাকে জানাইলে তাহার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সে কথার কোনও উল্লেখ করিল না।

পরদিন অযোধ্যায় পৌঁছিয়া মহারাজার কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অজয় অবগত হইল—সেখানেও কর্ম্ম-প্রাপ্তির কোনও আশা নাই। বিফল মনোরথ হইয়া সে অযোধ্যায় কালবিলম্ব না করিয়া সেইদিনই কানপুর হইয়া জয়পুরে যাইবার মানসে ফৈজাবাদে আসিয়া কানপুর পর্য্যন্ত যাইবার টিকিট কিনিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফৈজাবাদে আসিয়া অজয় যখন রেলে উঠিল তখন সে গাড়ীতে অধিক লোক ছিল না, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই এক সঙ্গে এত লোক উঠিল যে গাড়ীতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। অধিকাংশ যাত্রীই অযোধ্যা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে 'পোঁটলা পুঁটলি' তোরঙ্গ বিছানা এত ছিল যে তাহাতেই গাড়ীতে বসিবার স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। ফৈজাবাদে মুসলমান ও হিন্দুস্থানী যাত্রীই সাধারণতঃ অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু সেদিন অধিকাংশ যাত্রীই ভদ্রশ্রেণীর বাঙ্গালী। বাঙ্গালী যাত্রীর ভিড় দেখিয়া অজয় কিছু ভীত হইয়া উঠিয়াছিল—পাছে কোনও পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝিতে পারিল তাহার সে আশঙ্কা অমূলক—যাত্রিগণের সকলেই তাহার অপরিচিত—অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক—অবশিষ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালী। তাহারা বসিবার স্থান লইয়া পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে এমন সময় আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটা মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই গাড়িতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পলকের মধ্যে দুই তিনজন যাত্রী ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ীর

দ্বার চাপিয়া ধরিল। আগন্তুক ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "মশায়রা করেন কি? দরজা ছাড়ুন—এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে!"

যাহারা দ্বার চাপিয়া ধরিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, "এ গাড়ীতে জায়গা নেই—অন্য গাড়ীতে যা'ন।"

আগন্তুক মিনতি করিয়া কহিলেন, "সব গাড়ীতেই এইরকম ভিড়—একটু জায়গা দিন—না হয় দাঁড়িয়ে যাব—সঙ্গে মেয়ে-ছেলে রয়েছে দেখছেন না?"

গাড়ীর ভিতর হইতে অপর একজন উত্তর দিল, "জায়গা নেই তা কি হবে? অন্য গাড়ীতে যা'ন।"

সেই সময়ে গাড়ীর মধ্যে অপর দুইজন যাত্রীর কলহ হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উদ্যোগ দেখিয়া, যাহারা দ্বার চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা দ্বার ছাড়িয়া সেই কলহে যোগ দিল। সেই সুযোগে আগন্তুক যেমন গাড়ীর দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া মহিলাটীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, অমনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের একজন এক লম্ফে আসিয়া আগন্তুককে ঠেলিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। আগন্তুকের আসন্ন বিপদ দেখিয়া অজয় চকিতে দ্বারের কাছে আসিয়া বাধাদানকারীকে সবলে টানিয়া আনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া আগন্তুককে কহিল, "আসুন—শীগ্‌গির আসুন।" আগন্তুক মহিলাটীর সহিত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ভদ্রলোকটী অজয়ের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,

"বাঁচালেন মশায়, নইলে মেয়েটীকে নিয়ে আজ বড়ই বিভ্রাটে পড়তুম্—আজ আর ট্রেণ নেই—সমস্ত রাত ষ্টেশনেই থাকতে হ'ত।"

যে ব্যক্তিকে সরাইয়া দিয়া অজয় আগন্তুককে গাড়ীতে প্রবেশ করাইয়াছিল সে ব্যক্তি "কি মশায় আপনি ঠেলে দেন?" বলিয়া অজয়ের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু অজয়ের সুদৃঢ় বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া ও তাহার অসাধারণ শারীরিক বলের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু তাহার সঙ্গী আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আপনি ত বাঁচলেন—আমরা যে মারা যাই—কত লোক দেখুন দেখি? রেলের আইন মানেন না?"

আগন্তুকের হইয়া অজয় উত্তর দিল, "রেলের আইন উনি ভাঙ্গেন নি, আপনারাই ভেঙ্গেছেন। এখনো এ গাড়ীতে দশজন লোক যেতে পারে। আপনারা বিছানা বাক্স তোরঙ্গ ব্রেকভ্যানে না দিয়ে বসবার জায়গা বোঝাই করে দিয়েছেন। দি'ন দেখি ওগুলো ওপরের বাঙ্কে তুলে—জায়গা হয় কি না দেখি?"

পরে সে প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অজয় আগন্তুককে কহিল, "আপনি এদিকে আসুন" এবং নিজের বসিবার স্থানটী দেখাইয়া দিয়া মহিলাটীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া

আগন্তুককে পুনরায় কহিল, "ততক্ষণ ওঁকে এইখানে বস্‌তে দিন। আমি সবারই জায়গা ক'রে দিচ্ছি।"

মহিলাটী অজয়ের নির্দ্দেশিত স্থানে বসিলে, অজয় যাত্রীদের বিছানা, তোরঙ্গ ও বড় বড় কতকগুলি মোট নিজেই উপরের বাঙ্কে গুছাইয়া রাখিয়া দিতেই, সে স্থানে যাহারা স্থানাভাবে দাড়াইয়াছিল সকলেরই বসিবার স্থান হইল। পরে অজয় পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আর এক খানি বেঞ্চের কিয়দংশ খালি করিয়া আগন্তুক ও মহিলাটীকে সেই স্থানে বসিবার জন্য ডাকিতে গিয়াছে, ইত্যবসরে আগন্তুককে বাধাদানকারীদিগের মধ্যে একজন ব্যক্তি সেই স্থানটী সমস্ত অধিকার করিয়া শয়ন করিল এবং আগন্তুককে সঙ্গে করিয়া অজয়কে আসিতে দেখিয়াই চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া—নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রার ভাণ করিল। তদ্দর্শনে আগন্তুক দুঃখিতস্বরে মহিলাটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আয় মা জ্যোৎস্না, এদিকে আয়, আমরা না হয় নিচেই চাদর বিছিয়ে বসি—বাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দে।"

অজয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কি! উনি ওখানে এক-পাশে বেশ আছেন—থাকুন না? আমরা দুজনেই না হয় এখানে বস্‌ছি।"

অজয়ের কথা শুনিয়া একজন প্রাচীন ব্যক্তি শায়িত লোকটার গা ঠেলিয়া তাহাকে কহিল, "ওহে পীতম্বর উঠে

বস না ? বাবুরা বস্‌তে জায়গা পাচ্ছেন না আর তুমি স্বচ্ছন্দে সটান হয়ে শুয়ে পড়্‌লে—বেশ যা হোক !"

পীতাম্বর কহিল, "আমার কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, আমাকে থামকা দিক্ কোরো না।"

পীতাম্বরের কথা শুনিয়া তাহার নিকটেই উপবিষ্ট জনৈক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক পরিস্কার বাঙ্গালায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "আপনি, কি রকম ভদ্র লোক ! আপনাদের একজন জাত ভাই স্ত্রীলোক সঙ্গে বিব্রত হয়ে গাড়ীতে উঠ্‌তে আস্‌ছিলেন, তাঁকে কোথায় সাহায্য করবেন, না—গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিলেন ! আবার এই ভদ্রলোক আপনাদের দশজনের বসবার জায়গা করে দিয়ে নিজে বসতে জায়গা পাচ্ছেন না, আর আপনি সটান শুয়ে পড়লেন। এই বুঝি আপনাদের বাঙ্গালীর ভাই ভাই ভাব ? ছি !"

পীতাম্বরের পক্ষ লইয়া তাহার অপর একজন সঙ্গী অজয়কে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "উনি ত বেশ বসে ছিলেন, সাত জনকে দাতব্য করে জায়গা ছেড়ে দিলেন কেন ? বলে—আপনি খেতে ভাত পায়না শঙ্করাকে ডাক।"

হিন্দুস্থানী ভদ্রালোকটী বিরক্তভাবে কহিলেন, "যান্ যান্ আর তর্ক করবেন না, আপনারা নিজের সুখ টুকু অত করে খোঁজেন ব'লেই আপনাদের এই দশা। পরের জন্যে এত টুকু

অসুবিধে ভোগ করতে জানেন না বলেই অত বুদ্ধিমান হয়েও আপনারা অধঃপাতে গিয়েছেন।”

পীতাম্বর সাহস পাইয়া বন্ধুর কথায় সমর্থন করিবার আশায় কহিল, “তা আপনারাই নিজের সুবিধে ছেড়ে কথা ক’ন বটে! আপনাদের জ্বালায় কোনও ব্যবসা করবার যো নেই—এমন জায়গা নেই যেখানে মাড়োয়ারী গিয়ে ঢোকেনি।”

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আমি মাড়োয়ারী নই। যা হো’ক আমি না হয় স্বীকার করলুম যে ব্যবসা করে অবস্থা উন্নতি করবার জন্য আমারা দেশ বিদেশে গিয়ে থাকি—অনেক কষ্ট স্বীকার করি। কিন্তু আপনাদের কেরাণীগিরির ভাগটা ত আর আমরা কেড়ে নিচ্ছিনি—ওটা আপনারা জন্ম জন্ম ভোগ দখল করুন। এখন দয়া করে একটু পা তুলে বসুন।”

অগত্যা পীতাম্বর নিতান্ত অনিচ্ছায় বেঞ্চ হইতে গাত্রোৎপাটন করিতেই, অজয় তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগ্‌টা উঠাইয়া বাঙ্কে রাখিয়া আগন্তুককে মহিলাটীর পার্শ্বে বসিবার স্থান করিয়া দিয়া নিজে তাঁহার সম্মুখের বেঞ্চে বসিল।

এদিকে শয়নে ব্যাঘাত হওয়ায় পীতাম্বর অন্য উপায়ে আপনার সুখ সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল! সে দেখিল যে সময়ে তাহারা বিবাদ বিসম্বাদে কালক্ষেপ করিতেছিল, সেই অবসরে অপর একজন যাত্রী সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া

নিবিষ্টমনে তামাকু সাজিয়া কলিকায় ফুৎকার দিতে ছিল। অগ্নি ধরিতেই সে যেমন একটী ক্ষুদ্র হুঁকা বাহির করিয়া, তাহাতে কলিকাটী বসাইয়া, টানিবার উদ্যোগ করিতেছে সেই সময়ে পীতাম্বর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া তাহাব নিকটে গিয়া বলিল, "বেশ লোক ত? তামাকটা কি একলা খাবে নাকি?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে কলিকাটী খুলিয়া লইয়া, কলিকায় হস্ত সংযোগে উপর্য্যুপরি সজোরে টান দিতে লাগিল। গাড়ীর সেই অংশ তাম্রকূটের ধূমে ধূমাকার হইয়া গেল।

তদ্দর্শনে অজয় গাড়ীর জানালা খুলিয়া দিয়া অনুযোগের স্বরে তাহাকে কহিল, "ওখানে মেয়েরা রয়েছেন—এদিকে এসে খা'ন না?"

পীতাম্বর উত্তর দিল, "কেন—এতে আব দোষ হয়েছে কি?"

অজয় কহিল, "দোষ কি হয়েছে, তা আপনি যদি তামাক না খেতেন তা হ'লে বুঝ্‌তেন—যারা তামাক খান না তাঁদের ধোঁয়াটা ভাল লাগে না—বুঝ্‌লেন?"

পীতাম্বর কহিল, "তা হলে এ গাড়ীতে আস্‌তে নেই—ফাষ্ট কেলাসে যেতে হয়।"

পীতাম্বরের কথা শুনিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটী তাঁহার বুকের পকেট হইতে দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখাইয়া

সহাস্যমুখে কহিলেন, "ফাষ্ট ক্লাসেরই টিকিট কিনেছিলুম মশায় —কিন্তু সে গাড়ীতে দুজন সাহেব উঠেছে দেখে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে না গিয়ে, আপনার জাত ভাইদের কাছেই এ গাড়ীতে এসেছি।"

এমন সময় পীতাম্বর কলিকাটী তাহার অধিকারীকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া তাহার গাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিল। সকলে "আগুন! আগুন"! করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অক্ষয় চকিতের মধ্যে উঠিয়া কলিকাধারীর গায়ের জামায় যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা হাত চাপড়াইয়া নিবাইয়া দিয়া, গাড়ীর উপরে যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিখণ্ড পড়িয়াছিল তাহা জুতা দিয়া চাপিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

আগন্তুক, ভদ্রলোকটী কহিলেন, "ঐ জন্যেই ত গাড়ীতে, থিয়েটারে, তামাক চুরুট খাওয়া নিষেধ। সময়ে সময়ে সামান্য অসাবধানের জন্যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায়।"

পীতাম্বরের সঙ্গী কহিল, "আপনাদের জন্যেই ত এ সব বিভ্রাট হ'ল। মাথার ওপর ঠিক্ ঠিক্ করেই ত আগুনটা ফেলালেন। মেয়ে মানুষকে পুরুষদের গাড়ীতে আনা কেন?— মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিতে হয়।"

আগন্তুক ভদ্রলোকটী কিছু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, "একলাটী সেখানে থাকে কি করে? তাই রেলে যাতায়াতের

সময় কাছেই ওকে রাখি। তা আমরা লক্ষ্ণৌএ নেমে যা'ব—আপনাদের বেশীক্ষণ কষ্ট দেবো না।"

অজয় তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, "না—না আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? উনি থাকুন না—এতে আর আমাদের কষ্ট কি?"

আগন্তুক কহিলেন, "না—সেইখানেই আমরা যাচ্ছি। ফৈজাবাদে আমার মেয়েটীকে বহু-বেগমের কবর দেখাতে এনে ছিলুম—চমৎকার কবর—দেখেছেন কি?"

অজয় কহিল, "না—রেল থেকে একটা উঁচু গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল—সেই টাই বুঝি?"

আগন্তুক কহিলেন, "হাঁ, বেগমের সমাধিভবন একটা দেখবার জিনিস বটে। তাজের মত মার্ব্বেল পাথরের নয়—ইটে গাথা—কিন্তু কি সুন্দর গড়ন! গম্বুজের নিচে থাকে থাকে চার পাঁচটা খিলানের ছাদ—ওপর তলা থেকে ফৈজাবাদ সহরটা যেন একখানি ছবির মত দেখায়। তা দেখে জ্যোৎস্নার আমার কি যে আনন্দ!"

সেই কথা শুনিয়া স্বতঃই অজয়ের দৃষ্টি আগন্তুকের কন্যার দিকে ধাবিত হইল। জ্যোৎস্না নিজের কথা শুনিয়া সলজ্জভাবে গাড়ীর মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। অজয় চকিত-দৃষ্টিতে দেখিল, জ্যোৎস্না বালিকা নহে—তরুণী; গৌরী নহে—উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গিনী, কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী—

তন্বী—লাবণ্যময়ী। জ্যোৎস্নাকে—নিজের নামোল্লেখ শুনিয়া, সঙ্কুচিতা দেখিয়া অজয় প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের মানসে বলিল, "লক্ষ্ণৌএ কি নবাবদের কীর্ত্তি—এমামবাড়ী টাড়ি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন ?"

আগন্তুক কহিলেন, "না আমরা এখন সেইখানেই থাকি; বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে পশ্চিমে এসে—এখন লক্ষ্ণৌএই একরকম বাস করেছি। যদি কখনো ওখানে যান ত গরিবের বাসায় গেলে বড়ই সুখী হ'ব জানবেন—আমার নাম ধরণীধর বসু—ষ্টেশনে আমার নাম করলেই গাড়োয়ানেরা বাসায় পৌঁছে দেবে।"

অজয় কহিল, "যে আজ্ঞা যদি কখন আবার এদিকে আসি, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

অজয় নিজের পরিচয় স্বেচ্ছায় দিল না দেখিয়া ধরণীবাবুও সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলেন না। তাহার পর উভয়ের আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। গাড়ীর মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া অজয় রেলপথের ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল; তখন অপরাহ্নের আলোক ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়ায় মিশিয়া যাইতেছিল। পশ্চিম গগনে অস্তগামী তপনের রক্তিম কিরণ-ছটা খণ্ড খণ্ড মেঘমালাকে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল। অজয় শূন্য-দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যের দিকে চাহিয়াছিল। দিক্‌চক্রবালে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমশঃ ঘনতর হইয়া বাহিরের দৃশ্য অন্ধকারে মিশাইয়া

দিল। তথাপি অজয় সেই অন্ধকারের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী আসিয়া লক্ষ্ণৌএ পৌছিল। ধরণী বাবু গাড়ী হইতে নামিবার জন্য উঠিয়া কন্যাকে ডাকিতেই অজয়ের যেন তন্দ্রা ভঙ্গ হইল।

ধরণী বাবু অজয়কে কহিলেন, "আসি তাহ'লে আমরা—আপনি এঁদের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাচ্ছেন না বোধ হয়?"

অজয় হাসিয়া কহিল, "না—ওদিকে যা'ব না—অন্য গাড়ীতে যেতে হবে—এখন কানপুরে গিয়েই নাম্‌ব।"

অজয় তাঁহাকে নমস্কার করিল। ধরণীবাবু প্রতি-নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

অজয় উত্তর দিল, "আজ্ঞে না—কায়স্থ, আমার নাম অজয়কুমার মিত্র।"

ধরণী বাবু কহিলেন, "আমাদের স্বজাতি!" এবং আগ্রহের সহিত কর প্রসারিত করিয়া অজয়ের সহিত কর-মর্দ্দন করিলেন। বিদায়কালে জ্যোৎস্নার দিকে দৃষ্টি পতিত হইতেই অজয় দেখিল তাহার চকিত-প্রেক্ষণে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া রহিয়াছে।

তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া যাইলে অজয় আসিয়া জানালার কাছে তাহার পূর্ব্বস্থানে—যেখানে জ্যোৎস্না বসিয়া ছিল—সেইখানে বসিল।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। পরে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়া ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূর যাইতেই

উহার সহিত বিপরীত দিক হইতে বেগে সমাগত একখানি মালগাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষ হইল। দুইখানি এঞ্জিন ও কয়েকখানি গাড়ী একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল—কয়েকখানি গাড়ী উল্টাইয়া পড়িল—তাহার উপর আবার কয়েকখানি গাড়ীতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া সংঘর্ষের ফল ভীষণতর করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকার শব্দ উঠিল—আহতের চীৎকারে, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে, অবশিষ্ট জীবিত যাত্রীদিগের উচ্চ-কোলাহলে সংঘর্ষের স্থল বীভৎস শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্ণৌ সহরে রেলগাড়ীর সংঘর্ষের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লোকমুখে প্রচারিত হইল—দুই তিন শত লোক হত ও আহত হইয়াছে এবং মৃত ব্যক্তিদিগের লাস রাত্রির মধ্যে রেল কোম্পানিরা বহন করিয়া লইয়া গিয়া নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই জনরবে লক্ষ্ণৌ বাসীদের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল এবং দলে দলে লোকেরা দুর্ঘটনার স্থলে যাইয়া তাহাদের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ধরণীবাবু প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার বাসায় বসিয়া চা খাইতেছেন এমন সময় তাঁহার বন্ধু ও অনুগত ব্যক্তিগণ একে একে আসিয়া তাঁহাকে রেলের দুর্ঘটনার সংবাদ দিল এবং তিনি যে সেই গাড়ীতেই ছিলেন শুনিয়া তাঁহার ও তাঁহার কন্যার আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

ধরণীবাবু বাড়ীর ভিতরে গিয়া জ্যোৎস্নাকে সেই দুঃসংবাদ দিতেই জ্যোৎস্না শঙ্কিতভাবে কহিয়া উঠিল, "বাবা, যে ভদ্র-লোকটী গাড়ীতে আমাদের জায়গা করে দিয়েছিলেন, তাঁর ত কোন বিপদ ঘটে নি?"

ধরণী বাবু কন্যার প্রশ্নে বিচলিত ভাবে কহিলেন, "তা ও ত বটে! একবার খোঁজ নেওয়া ত উচিত? যাব না কি?"

জ্যোৎস্না ব্যগ্র ভাবে কহিল, "যাবেন বৈকি। তাঁর সঙ্গে ত কোন চেনা লোক ছিল না। যা'ন একবার গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসুন।"

ধরণীবাবু তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যেই নিজের বেগবান অশ্বযুগলে চালিত গাড়ীতে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনের অল্প দূরেই সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেখানে বিপুল জনতা—পুলিশ প্রহরীরা ঘটনাস্থলে বিনা প্রয়োজনে কাহাকেও যাইতে দিতেছিল না। রেলওয়ে সীমার বহির্দ্দেশে দর্শকেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধরণী বাবু লক্ষ্ণৌএর একজন সম্ভ্রান্ত লক্ষপতি বণিক। ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাকে চিনিত ও শ্রদ্ধা করিত। ধরণী বাবু ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে প্রহরিগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট অবগত হইলেন, এঞ্জিনড্রাইভার ও তাহার সহকারী প্রভৃতি ৬ জন রেলের কর্ম্মচারী ব্যতীত দশজন মাত্র যাত্রী মারা গিয়াছে কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ জন আঘাত পাইয়াছে—তন্মধ্যে সাত আট জন বোধ হয় সাংঘাতিক রূপে আহত। মৃতদেহ তখনও স্থানান্তরিত করা হয় নাই—আহতগণের সাময়িক চিকিৎসার জন্য তাঁবু ফেলিয়া অস্থায়ী হাঁসপাতালের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হত ও আহত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়গণ ব্যতীত অধিকাংশ সুস্থ যাত্রীদিগকে স্পেশাল্ ট্রেণে কানপুরে পাঠান হইয়াছে, সেখানে গাড়ী বদল করিয়া তাহারা স্বস্ব গন্তব্য স্থানে যাইবে।

ধরণী বাবু মৃত ও আহত ব্যক্তিগণকে দেখিতে চাহিলে ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহাকে অস্থায়ী শবাগার ও চিকিৎসাগার দেখাইয়া আনিবার জন্য তাহার সহকারীকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিল। মৃতব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজনের দেহ এরূপ বিকলাঙ্গ অথবা দগ্ধ হইয়াছিল যে তাহাদিগকে চিনিবার উপায় ছিল না। তত্রাচ ধরণী বাবু সেই দেহগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। অজয়ের সহিত মৃতব্যক্তিগণের কাহারও সাদৃশ্য না দেখিয়া তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আহত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পার্শ্বের তাঁবুতে যাইলেন। সেখানে কাহারও কাহারও দেহে অস্ত্রোপচার হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে অজয়কে দেখিতে না পাইয়া ধরণী বাবুর মন হইতে একটা গুরুভার নামিয়া যাইল—অজয় প্রাণ হারায় নাই, নিরাপদে আছে স্থির করিয়া তিনি হাসপাতালের তাঁবু হইতে বাহিরে আসিতেছেন এমন সময় রেলওয়ের একজন ডাক্তার সাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা ছাড়া, আঘাত পেয়েছে এমন আর কোনও লোক আছে কি?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর দিলেন, "আর একজন আছে,

তাহাকে নিস্তব্ধ স্থানে রাখা দরকার বলে—স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে—আসুন এদিকে আসুন।”

ধরণী বাবু ডাক্তার সাহেবের সহিত সেই তাঁবুর পার্শ্বেই আর একটী ক্ষুদ্র তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—সম্মুখের খাটিয়ায় একজন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে—নিকটে গিয়াই চিনিলেন সে ব্যক্তি অজয়। অজয়ের দেহ নিস্পন্দ—মৃতবৎ, কিন্তু তাহার অঙ্গে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “এ লোকটীর অবস্থাও শঙ্কটাপন্ন—বোধ হয় মস্তিষ্কে কোনরূপ আভ্যন্তরীণ আঘাত পেয়েছে—সংজ্ঞা আর না ফিরিতেও পারে। এ ব্যক্তির সঙ্গে আপনার যদি পরিচয় থাকে তাহলে ইহাঁর আত্মীয়দিগকে তার করুন।”

ধরণী বাবু বলিলেন, “ইনি আমার পরিচিত, কিন্তু ইহার আত্মীয়দের ঠিকানা আমি জানি না। ইহার সঙ্গে একটী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ছিল—তাহাতে কি কোনও চিঠি পত্র পাওয়া যায় নাই?”

ডাক্তার বলিলেন, “গাড়ী থেকে ইহাদের টেনে বের করে আনা হয়েছিল—ইনি যে গাড়ীতে ছিলেন সে গাড়ীতে আগুন লেগেছিল—তা'তে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল সমস্ত পুড়ে গেছে। তবে ইহার কোটের পকেটে এই নোটকেস্‌টী পাওয়া গিয়েছে—এখনো পুলিশে জমা দেওয়া হয় নাই।” এই কথা বলিয়া ডাক্তার তাঁহার পকেট হইতে একটী নোটকেস্

বাহির করিয়া ধরণীবাবুকে তাহার ভিতরে যাহা ছিল তাহা একে একে দেখাইলেন। নোটকেসের মধ্যে ফৈজাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত একখানি মধ্যমশ্রেণীর টিকিট, নোটে ও টাকায় ১২৩৷৵০ এবং পাঁচখানি কার্ড ও একটা চাবি পাওয়া গেল—কার্ডে ইংরেজিতে লেখা ছিল—"অজয় কুমার মিত্র।"

ধরণীবাবু হতাশভাবে কহিলেন, "তা হলে ত এঁর বাড়ীতে খবর দেবার কোনও উপায়ই দেখছি না। ফৈজাবাদে কি কানপুরে যে এঁর বাড়ী নয়, তা কথার ভাবে বুঝতে পেরেছিলুম! যা' হো'ক এঁর যা'তে চিকিৎসার কোন ত্রুটী না হয় তা'র বন্দোবস্ত করেদিন—টাকা যা' পড়্বে আমি তা দেব—একজন নার্স এখনি না হয় দয়া করে আনিয়ে নিন্।"

এই কথা বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সহকারীর হস্তে ধরণী বাবু তৎক্ষণাৎ দুইশত টাকার নোট দিয়া বলিলেন "আমি আবার একটু পরে এসে খবর নেব।"

ধরণী বাবু বাটীতে ফিরিয়া গিয়া জ্যোৎস্নাকে সকল কথা বলাতে, জ্যোৎস্না অজয়ের অবস্থার কথা শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল, "বাবা, অজয়বাবুকে আমাদের বাড়ীতে এনে চিকিৎসা করালে হয় না?"

ধরণী বাবু কহিলেন, "এখন নাড়া চাড়া করবার উপায় নেই—যদি সিবিল সার্জ্জন দেখে অনুমতি দেন ত নিয়ে আস্ব।"

আহারাদি করিয়া ধরণীবাবু পুনরায় অজয়কে দেখিতে

াইলেন। তখন সিবিল সার্জ্জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ধরণী বাবু তাঁহাকে, যতবার প্রয়োজন হয়, অজয়কে দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং দর্শনী দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেদিন অজয়কে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করাতে তিনি সম্মতি দিলেন না। পরদিন সিবিল সার্জ্জনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একখানি দোলা প্রস্তুত করাইয়া ধরণীবাবু অজয়কে তাঁহার বাটীতে লইয়া আসিলেন। সেদিন সিবিল-সার্জ্জন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আর তাহার জীবনের আশঙ্কা নাই, কিন্তু তাহার শূন্য-দৃষ্টি দেখিয়া তিনি কিছু ভীত হইয়াছিলেন।

পরদিন অজয় অধিকতর সুস্থ হইল, কিন্তু ধরণীবাবুকে কি জ্যোৎস্নাকে চিনিতে পারিল না। ধরণীবাবু ও জ্যোৎস্না উভয়েই অজয়কে নিতান্ত আত্মীয়ের মত যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সুচিকিৎসায় ও শুশ্রূষার গুণে অজয়ের স্বাস্থ্য ও জ্ঞান দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ পরে সিবিল সার্জ্জন বলিলেন আর তাহার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। তখন অজয় দুই একটী কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ধরণী বাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—অজয়কে তাহার পরিচয় ও নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না—শূন্য-দৃষ্টিতে বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। ধরণী বাবু পুনরায় সিবিল সার্জ্জনকে ডাকাইয়া

জানিলেন। সিবিল সার্জ্জন নিজে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহার পরিচিত আর দুইজন ডাক্তারকে তার করিয়া ধরণী বাবুর অনুরোধে আনাইলেন। সকলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মস্তিষ্কে স্নায়বিক আঘাত লাগিয়া রোগীর পূর্ব্বস্মৃতি আংশিক ভাবে লোপ পাইয়াছে। সে স্মৃতি রোগী আবার ফিরিয়া পাইবে কিনা, ফিরিয়া পাইলেও কতদিনে পাইবে, এবং তাহা অল্পে অল্পে জাগরিত হইবে কি কোনও সময়ে হঠাৎ ফিরিয়া আসিবে তাহা বলা কঠিন।

সেই মন্তব্য শুনিয়া কিন্তু ধরণীবাবুর ও জ্যোৎস্নার অজয়ের প্রতি যত্নের ব্যতিক্রম ঘটিল না। ধরণী বাবু চিকিৎসার ফলে নিরাশ হইয়া শেষে বলিলেন, "যতদিন না ওঁর আত্মীয়দের সন্ধান করে বের করতে পারি—কি ওঁর পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে না আসে—ততদিন উনি আমাদের কাছেই থাকুন—আমাদের স্বজাত ত?"

জ্যোৎস্না হৃষ্টচিত্তে সে কথায় অনুমোদন করিল এবং সহোদরার মত অজয়কে স্নেহ যত্ন করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এস্থলে ধরণী বাবুর ও জ্যোৎস্নার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ধরণী বাবুর আদি নিবাস হুগলি জেলায় পালংপুর গ্রামে। তাঁহার পিতামহ একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। বালক-কালে ধরণী বাবুর পিতা মাতার মৃত্যু হইবার পরে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাদের পৈতৃক ধনসম্পত্তি, প্রথমে বেনামী করিয়া, শেষে নিজের নামে করিয়া লইয়াছিলেন। ধরণী বাবুর জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তাঁহার হিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সেই কথা অবগত হইয়া তিনি পিতৃব্যকে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, পিতৃব্য তাঁহাকে আদালতের পথ দেখাইয়া দিয়া এবং দুর্ব্বাক্য বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ধরণী বাবুর বয়স তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র। তিনি আদালতের আশ্রয় না লইয়া, অন্যরূপে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে রিক্তহস্তে দেশত্যাগ করেন এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া শেষে একজন হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীর নিকট সামান্য বেতনের কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্ণৌএ আসেন। সেই কর্ম্মে তিনি মনিবের এরূপ বিশ্বাস ও স্নেহ ভাজন হয়েন যে ধরণী বাবুকে তাঁহার মনিব বিষয় কর্ম্মের সকল কথাই বলিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

এই ভাবে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে ধরণী বাবুর বুদ্ধিতে বা ভাগ্যে ঐ বণিকের ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি হয়, এবং তিনি ধরণী বাবুকে পুত্রের মত স্নেহ করিতে থাকেন। পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুকালে উক্ত বণিক তাঁহার সঞ্চিত অর্থ আত্মীয়দের দান করিয়া, ব্যবসায়ের সুনাম ধরণী বাবুকেই দান করিয়া যা'ন। তদবধি উত্তরোত্তর সেই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ধরণী বাবু একজন শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু বণিক বলিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বণিক সমাজের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ধরণী বাবু, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী ও কলিকাতায় তাঁহার ব্যবসায়ের এজেন্সী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং লক্ষপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের পর দুইবার ধরণী বাবু বাঙ্গালায় আসিয়া কিছু কাল বসবাস করিয়া গিয়াছিলেন। একবার দেশে আসিয়া তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু সাংসারিক সুখ তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী ৭।৮ বর্ষ বয়স প্রাপ্ত হইয়া, অবশিষ্টগুলি শৈশবেই মারা যায়, শেষে দশবৎসরের একমাত্র কন্যা জ্যোৎস্নাকে রাখিয়া তাঁহার পত্নী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পত্নীর মৃত্যুর পর ধরণী বাবু দেশ হইতে বাস উঠাইয়া পুনরায় লক্ষ্মৌএ গিয়া বাস করেন—কন্যাকে তিনি ৭

বৎসর কলিকাতায় রাখিয়া বেথুন কলেজে শিক্ষা দেন, কেবল দীর্ঘ অবকাশের সময় তাহাকে লক্ষ্ণৌএ লইয়া যাইতেন। নতুবা আপনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া—তাহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন। জ্যোৎস্না এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি পুনরায় দেশে আসিয়া বৎসরাধিক কাল বাস করিয়া তাহার বিবাহের চেষ্টা করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সুশ্রী ও গুণবতী কন্যার অনেক সুপাত্র সহজেই জুটিবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন সুপাত্রদিগের অভিভাবকগণের দৃষ্টি তাঁহার কন্যার দিকে নহে—তাহার অর্থের দিকে। একমাত্র কন্যাকে প্রচুর অর্থ যৌতুক দিতে তাঁহার কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু বরপক্ষীয়গণ যে তাঁহার কন্যার রূপগুণ অপেক্ষা তাঁহার অর্থকেই অধিকতর প্রার্থনীয় মনে করে ইহা তাঁহার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। জ্যোৎস্নাকে বিলাত-ফেরতের হস্তে সমর্পণ করিতেও ধরণী বাবুর মনে কোনও দ্বিধা ছিল না—কিন্তু তিনি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন সে সমাজে অর্থলালসা অধিকতর প্রবল—প্রকাশ্য ভাবে বরপণের প্রার্থনা না থাকিলেও, প্রকারান্তরে তাঁহারা কন্যার রূপগুণকে উপরি পাওনা ধরিয়া লইয়া কন্যার পিতার আর্থিক অবস্থা ও কি পরিমাণে যৌতুক দিবার শক্তি আছে সেইটারই প্রথমে ও বিশেষ করিয়া তত্ত্ব লয়েন। জ্যোৎস্নার বয়স তখন ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছিল—সে পিতার মনের কথা অবগত হইয়া তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিল। বস্তুতঃ

সেই তেজস্বিনী নারীর আত্মমর্য্যাদায় এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, যে পিতাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে ব্যথিত হৃদয়ে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে কহিল, "বাবা আমি কি আপনার এতই গলগ্রহ হয়েছি যে আমাকে বিদেয় না ক'রে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না? আমার ত আপনার কাছ ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না, তবে আপনি কেন এত ব্যস্ত হয়েছেন?"

ধরণী বাবু কন্যার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া অতিমাত্র বিচলিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার আশায় কহিলেন, "না মা, তুমি আমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের চেয়ে আদরের জিনিস। কিন্তু কি করবো, সমাজ ভুল বুঝ্‌বে—আমাকে স্বার্থপর ভাব্‌বে—তোমাকে ভালবাসিনা বল্‌বে, তাই আমার সর্ব্বস্বকে পরের হাতে দেবার জন্যে চেষ্টা করছি। দেখ্‌ছি তোমার আদর পরে বুঝ্‌বে না—তা জেনেও সমাজের মুখ চেয়ে, তোমাকে যে তুমি বলেই আদর করবে এমন লোকের বৃথা সন্ধান করছিলুম।"

জ্যোৎস্না কহিল, "না বাবা—সমাজ কি বল্‌বে সে ভাবনা আপনি ভাব্‌বেন না। আমার জন্যেই ত আপনার সমাজকে ভয়? তা সমাজ যখন আমাকে—আমাদের নারী জাতটাকে এত তুচ্ছ—ব্যবসায়ের বস্তু—ভাবে, তখন সে সমাজকে আমিই বা কেন শ্রদ্ধা করব, আপনিই বা কেন ভয় করবেন? আপনি যদি

ঐ সমাজের ভয়টা ত্যাগ করেন, তা হ'লে আমরা বেশ সুখে থাকতে পারি।"

ধরণী বাবু কন্যার কথায় প্রীত হইয়া আবেগভরে কহিলেন, "তাই হো'ক মা তবে, তুমি আমার ঘরেই থাক। আর সব মেয়েরাও যখন তোমার মত ভাবতে শিখবে—আপনাদের মর্য্যাদা বুঝতে পারবে—তখনই অপদার্থ পুরুষগুলোর চৈতন্য হবে—তা'রা বুঝবে যে তাদের মত কাপুরুষদের চেয়ে আমাদের কুললক্ষ্মীদের দাম ঢের বেশী। তখন তারা বাধ্য হয়ে নিজেরাই সাধ্যসাধনা ক'রে তোমাদের বরণ করে নিয়ে যাবে। তাহ'লে দেশের মঙ্গল হবে।"

তদবধি ধরণী বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কন্যা তাঁহাকে কন্যাদায়ের চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিলেও তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সেই চিন্তার ঘূর্ণিপাকে আনিয়া ফেলিতে লাগিল। মধুলোভে আকৃষ্ট মধুপকুলের ন্যায় ধরণী বাবুর সঞ্চিত রজত-চক্রের আকর্ষণে ধাবিত বরপুঙ্গবেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কন্যার পাণিপীড়নের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে লাগিল। জ্যোৎস্না সেই সকল প্রস্তাব শুনিলেই প্রস্তাবকারীদের প্রকৃত অভিসন্ধি পিতাকে বুঝাইয়া দিত। ধরণী বাবু প্রতি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং কোন কোনও প্রস্তাবকারীকে জানাইয়া দিতেন যে তাঁহার কন্যা, বঙ্গসমাজের

বরপণ গ্রহণ প্রথার প্রতিবাদ (passive resistance) স্বরূপ, যদি প্রয়োজন হয় ত, চির-কুমারী থাকিবেন সংকল্প করিয়াছেন।

বস্তুতঃই জ্যোৎস্না পুরুষ জাতির উপর উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ হইয়া শেষে তাহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পুরুষেরা নারীকে আপনাদের মুখাপেক্ষী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত করে—নিতান্ত অসহায় ও হীন ভাবে, বলিয়া জ্যোৎস্নাও তাহাদের হীন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বভাবতঃ সহৃদয় ধরণী বাবু তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার অন্তরে পুরুষজাতির প্রতি পরুষভাব দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বরপণ বিষয়ে ও নারীর মহত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কন্যার মতের সমর্থন করিতেন, কিন্তু তিনি ভাবিতেন কোমলস্বভাব নারীর মনে ঘৃণা বিদ্বেষাদি কোনরূপ কঠোর ভাব শোভা পায় না। সেরূপ অশোভন ভাব সতত হৃদয়ে পোষণ করিলে পাছে নারীজনসুলভ দয়া করুণা স্নেহ মমতাদি দেবোপম বৃত্তি সমূহ খর্ব্ব করিয়া নারী ও পুরুষ হৃদয়ের স্বাভাবিক ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সেই কারণে তিনি জ্যোৎস্নার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিছু ত্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নিঃসহায় ও বিপদগ্রস্ত অজয়ের সেবাশুশ্রূষাকার্য্যে জ্যোৎস্নার হৃদয় হইতে পুরুষ জাতির উপর অভিমান-জনিত অশ্রদ্ধার ভাব লুপ্তপ্রায় এবং

তাহার অন্তরে স্বাভাবিক দয়া করুণার পুনরুন্মেষ দেখিয়া ধরণী বাবু আন্তরিক প্রীত হইয়াছিলেন। অজয়কে আশ্রয় দিবার সুযোগ দিয়া জগৎপিতা তাঁহার যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি নিভৃতে বসিয়া বিশ্বপতির চরণোদ্দেশে বারে বারে প্রণাম করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ধরণী বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া অজয় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্বস্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইল। তাহার স্মৃতি-শক্তিরও দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। একজন বিশেষজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিৎ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নির্দ্দেশিত উপায়ে ধরণী বাবু অজয়ের স্মৃতিশক্তি পুনর্জীবিত করিবার সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রথমে একজন বিচক্ষণ শিক্ষকের সহায়তায়, পরে স্বকীয় চেষ্টায় অজয় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্ব শিক্ষার সুপ্ত-স্মৃতি জাগরিত করিল। ধরণীবাবুর জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধুর একটী সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। ধরণী বাবু বলিয়া দেওয়াতে অজয় সেই পুস্তকাগার হইতে পুস্তক আনিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বের অধীত গ্রন্থ সমূহ একবার মাত্র পাঠ করিলেই তাহার আয়ত্ব হইয়া যাইত। সেই হেতু তিন চারি মাসের মধ্যে অজয় ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অধিকাংশ ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ তাহার উচ্চ জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া ধরণী বাবু তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, জ্যোৎস্নাও তাহার নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধরণী বাবুর বাটীতে অজয়ের প্রায় একবর্ষ কাল কাটিয়া গেল কিন্তু অজয় কিছুতেই তাহার বিস্মৃত জীবনকথা স্মরণ করিতে পারিল না। অজয় সে জন্য যে মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইত তাহা তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে পাছে অজয়ের মনে কষ্ট হয়, সেই জন্য ধরণী বাবু সে বিষয়ে তাহার সহিত কোনও কথা কহিতেন না। অজয়কে বিমর্ষভাবে উদাস দৃষ্টিতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথম প্রথম ধরণী বাবু ও জ্যোৎস্না উভয়েই মনে করিত বুঝি তাহার প্রতি তাঁহাদের যত্ন আদরের ত্রুটি হইতেছে। সেই কথা অজয়ের নিকট উত্থাপন করাতে অজয় তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করিল যে তাঁহারা তাহাকে যেরূপ যত্নে ও আদরে রাখিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক যত্ন যে অপর কোন ব্যক্তি কোনও অতিথিকে করিতে পারে তাহা অজয়ের ধারণায় আসেনা এবং সেইদিন হইতে অজয় তাহার বিমর্ষতা ও মনের ব্যাকুলতা গোপন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অজয়ের সেই চেষ্টা জ্যোৎস্নার স্নেহদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। শেষে একদিন জ্যোৎস্না তাহার পিতাকে কহিল, "বাবা, অজয় বাবু ঘরে ফিরে যাবার জন্যে, আত্মীয় স্বজনদের দেখবার জন্যেই বোধ হয় ছট্ ফট্ করছেন। ওঁকে নিয়ে গিয়ে একবার তীর্থ স্থান গুলো, কি বড় বড় সহর গুলো ঘুরিয়ে নিয়ে এলে হয় না? তা হলে হয়ত

ওঁর কোনও আপনার লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে—উনি যদি তাঁদের না চিনতে পারেন, তাঁরাও ত ওঁকে চিনতে পারবেন ? তা হ'লেই কথায় কথায় ওঁর আগের কথা হয়ত সব মনে পড়ে যাবে।"

ধরণী বাবুর অজয়কে বিদায় দিবার ইচ্ছা ছিল না—অজয়ের উপর ধরণী বাবুর একটা অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সেই হেতু পাছে কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হইলেই অজয় তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ধরণী বাবু জ্যোৎস্নার সে কথাটায় প্রথমে প্রশ্রয় দিলেন না, বলিলেন—"এত বড় দেশটার কোথায় ওঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াব বল ? আর উনি যে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন, সে কথা নিজে কি কোন দিন বলেছেন ?"

জ্যোৎস্না বলিল, "না উনি কিছু বলেন নি। ওঁকে এত যত্নে আপনার লোকের মতন আমরা রেখেছি, তবু ওঁর এখানে থাকতে ভাল লাগ্‌ছে না—এটা জানতে পারলে পাছে আমরা ওঁকে অকৃতজ্ঞ মনে করি, বোধ হয় সেই ভয়েই উনি নিজে কিছু বলেন না। আর তা না হলেও আমাকে ত আপনি বলেছিলেন তীর্থস্থানগুলো আর বড় বড় সহর গুলো একবার দেখিয়ে নিয়ে আসবেন ? তা এই সময়ে একবার চলুন না ? তা হলে একসঙ্গে অজয়বাবুরও আপনার লোকেদের খোঁজা হবে আর আমারও দেশ দেখা হবে।"

ধরণী বাবু সে দিন কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মা ভেবে দেখি। কাল তোমাকে যা হয় ঠিক করে বল্‌বো।"

ধরণীবাবু ভাবিয়া দেখিলেন অজয়কে যখন তিনি প্রাণরক্ষা করিয়া গৃহে স্থান দিয়াছেন তখন তাহার আত্মীয়দের অনুসন্ধান করা তাঁহার একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। আর সেই উপলক্ষে জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইলে তাহাকে সুখী করা হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহার শিক্ষারও একটা অভাবপূরণ করা হইবে। জ্যোৎস্না মুখে বলিয়া থাকে বটে অপদার্থ পুরুষদের নিকট আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া বিবাহ না করিয়া সে বেশ সুখে আছে, কিন্তু ধরণী বাবু বুঝিতে পারিতেন যে পতির ভালবাসা ও সন্তানের স্নেহমমতা লাভের দ্বার স্বেচ্ছায় রুদ্ধ রাখিয়া জ্যোৎস্না নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে—সুতরাং তাহার প্রকৃত-পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব। সে তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা অপূর্ণতা অনুভব করিবেই—একটা নৈরাশ্যের ছায়া তাহার মানসাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেই। সেই অবসাদের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য তাহার মনকে সর্ব্বদাই কোনও প্রীতিকর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা কর্ত্তব্য। তাহার শিক্ষার আগ্রহ আছে—দেশ ভ্রমণে নূতন নূতন স্থানে নব নব দৃশ্যে তাহার মন ব্যাপৃত থাকিবে এবং নানাবিষয়ের

প্রত্যক্ষ দর্শনে তাহার জ্ঞানের প্রসারতা ও মনের ঔদার্য্য বৃদ্ধি করিবে।

এইরূপ ভাবিয়া পরদিন তিনি জ্যোৎস্নাকে বলিলেন, "তাই কর মা—অজয়কে নিয়ে একবার আমরা বেড়িয়ে আসিগে চল। একেবারে সব জায়গায় যাওয়া হবে না। প্রথমে আমার যেখানে যেখানে কারবার আছে, সেই সব জায়গায় নিয়ে যা'ব। আগে আগ্রায় যাই চল—তারপর কাশী হয়ে কলকাতাটা ঘুরিয়ে আনি—ফেরবার সময় এলাহাবাদ হয়ে আস্ব। এই সবকটা জায়গাতেই বাঙ্গালীর বাস আছে—অজয়ের বন্ধুদের খোজবারও সুবিধা হ'বে, আর তোমার দেখবার জিনিসও ঢের আছে। তুমি ওসব জায়গায় গিয়েছ বটে—কিন্তু বেশীদিন না থাক্‌লে সব দেখা শুনো হয় না—আমরা কিছু বেশীদিন করেই এবার একএকটা জায়গায় থাক্‌ব। বিষয় কর্ম্মের সেই রকম বন্দোবস্ত করেই যা'ব।"

সেই কথামত সপ্তাহ কাল পরে তাহারা সকলে মিলিয়া প্রথমে আগ্রায় যাত্রা করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আগ্রায় আসিয়া জ্যোৎস্না বাদসাহদিগের চিরস্মরণীয় স্থাপত্যকীর্ত্তি সমূহ দেখিতে এতই একাগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে অজয়ের আত্মীয়বন্ধুগণের অনুসন্ধানের কথাটা তাহার মনেই আসিত না। সে আরও কয়েকবার আগ্রায় আসিয়া সেই স্থানের দুর্গ, মস্‌জিদ, সমাধিভবনাদির অতুল্য শোভাসম্পদ দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এবারে অজয় সঙ্গে থাকায়, তাহার ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রভায় বিরঞ্জিত হইয়া সেগুলি যেন নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া জ্যোৎস্নাব নয়নে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দেখিতে গিয়া জ্যোৎস্না যখন অজয়ের মুখে শুনিল যে সমাধির দ্বিতলের উপরে নকল-সমাধির চারিপার্শ্বে বিবিধবর্ণের সুন্দর প্রস্তরগুলি জয়পুর হইতে মহাবাজ মানসিংহ প্রদান কবিয়াছিলেন, সমাধির চতুর্দ্দশটা চূড়া, চতুর্দ্দশ সুবার নিদর্শন, ইত্যাদি, তখন জ্যোৎস্না সেই সুন্দর সমাধিভবনের কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিল না—ঐতিহাসিক স্মৃতির যাদুস্পর্শে সেগুলিতে যেন একটা নূতন আকর্ষণ আসিল। তোরণের চারি কোণের মিনারগুলির চূড়া ভগ্ন দেখিয়া (তখনও সেগুলির সংস্কার হয় নাই)

সে যখন অবগত হইল যে আগ্রা আক্রমণ করিতে আসিয়া জাঠেরা সেগুলি ভগ্ন করিয়াছিল, তখন জ্যোৎস্না বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধের সময় কি মানুষের জ্ঞান থাকে না? এমন সুন্দর জিনিস, কি করে—তা'রা ভাঙ্গ্‌লে?"

অজয় উত্তর দিল, "যুদ্ধের সময় মানুষে আর হিংস্রক পশুতে কোনও তফাৎ থাকে না। সৌন্দর্য্য-বোধটা মানুষেরই আছে, পশুদের নেই—কাজেই মানুষ যখন পশুর মতন হয়ে যায়, তখন আর তা'র সুন্দর জিনিষ ভাঙ্গতে মায়া হবে কেন? সব ভেঙ্গে চূরে একাকার করে দেয়।"

যেদিন জ্যোৎস্না অজয়ের সঙ্গে যমুনার পরপারে ইতিমাৎ-দ্দৌলার সমাধিভবন দেখিতে যাইল সেদিন আর তাহার আনন্দ ধরে না। পিতৃস্নেহের মত প্রবল বৃত্তি জ্যোৎস্নার হৃদয়ে আর কিছু ছিল না। সে যখন শুনিল নূরজাহানই তাহার পিতার কবরের উপর সেই সুরম্য সমাধিভবনটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহার পিতৃভক্তির স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে—তখন জ্যোৎস্না যেন সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমাধিভবনটীকে স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বলিত দেখিল। সেই কারণেই জ্যোৎস্না অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের রক্তিমাভ প্রস্তরে নির্ম্মিত আগ্রার জুম্মামসজিদটিকে—দুর্গের অভ্যন্তরের শুভ্রতম মর্ম্মর-পাষাণে গঠিত অনিন্দ্য-সুন্দর মতিমসজিদ অপেক্ষাও সুরম্য দেখিত। সেই জুম্মামসজিদটী যে বেগমসাহেব জাহানারার নির্ম্মিত! বাদসাহজাদী

অনুপম সুন্দরী ও বিদূষী জাহানারা যে আমরণ অনূঢ়া থাকিয়া বৃদ্ধ পিতা সাজাহানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল—বাদসাহের অন্তঃপুরের বিলাস-ব্যসন স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া পিতার সহিত কারাবাসই তাহার ইহজীবনের সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল—সেই হেতু জাহানারার প্রতি অপার শ্রদ্ধায় জ্যোৎস্নার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কারণেই জাহানারার স্মৃতি-বিজড়িত জুম্মমস্‌জিদের পার্শ্ব দিয়া জ্যোৎস্না যতবার গাড়ী করিয়া যাইত ততবার সে অতৃপ্ত নয়নে সেই মসজিদের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেদিন সে ধরণী বাবুর ও অজয়ের সহিত দুর্গের মধ্যে, দুর্গের যে অংশে ঔরঙ্গজেব সাজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই অংশটা প্রথম দেখিল, সে দিন, মানুষে যে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া যাতনা দিতে পারে সেই কথা স্মরণ করিয়া জ্যোৎস্না আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—ঔরঙ্গজীবের নিষ্ঠুরতা স্মরণে সমস্ত পুরুষ জাতির উপর বিতৃষ্ণ হইয়া গভীর ক্ষোভে সত্য সত্যই সকলের সমক্ষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ধরণী বাবু তাহার নয়নাসার-বিধৌত মুখখানি বুকে টানিয়া আনিয়া স্নেহ-বাক্যে সান্ত্বনা দিলে তবে সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

অজয়ের সহিত তাজমহল দেখিতে গিয়া কিন্তু জ্যোৎস্নার হৃদয়ে পোষিত পুরুষ-বিদ্বেষের একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। পুরুষের পত্নী-প্রেমকে এতদিন জ্যোৎস্না একটা কথার কথা—

একটা স্বার্থ-প্রণোদিত মোহ বলিয়া উপহাস করিত। পতি পত্নীর প্রেম যে পিতার প্রতি ভালবাসা, পরদুঃখ মোচনের ইচ্ছা প্রভৃতির মত মানব হৃদয়ের একটা উচ্চ ও কোমলতম বৃত্তি, জ্যোৎস্না তাহা স্বীকারই করিত না। কিন্তু প্রেমপূজার বিরাট নৈবেদ্য—স্বর্গপথ-নির্দ্দেশী-চূড় অমলধবল তাজের ছায়ায় দাঁড়াইয়া যেদিন অজয়ের মুখে জ্যোৎস্না শুনিল যে, কোনও ইংরাজ মহিলা সেই সমাধিসৌধ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ তাঁহার কবরের উপর অমন স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তাহা হইলে তিনি তদ্দণ্ডেই মরিতে প্রস্তুত, তখন সেই 'প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুর' জগতে অতুল সমাধি-মন্দিরের বাহ্য শোভা দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্নার মনে পুরুষের প্রতি পরুষ ভাবটাও কি যেন এক মায়ামন্ত্রে কোমল হইয়া আসিল। সেই দিন হইতে বেড়াইতে বাহির হইলেই জ্যোৎস্না একবার তাজগঞ্জের দিকে না আসিলে তাহার সে দিনের সান্ধ্য-ভ্রমণে যেন তৃপ্তি হইত না।

অজয়েরও তাজ দর্শন করিয়া যেন আশা মিটিত না; তাহার হৃদয়ের কোন নিভৃত কন্দরে কোথায় পত্নীপ্রেম লুকাইত ছিল কিনা তাহার সন্ধান সে রাখিত না, কিন্তু তাজমহল দেখিতে আসিলে অজয়ের যে ভাবান্তর উপস্থিত হইত—সে যে আত্মহারা হইত—ইহা জ্যোৎস্না একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছিল। এক দিন তাহারা পূর্ণিমা রাত্রে তাজ দেখিতে আসিয়াছিল। তাজের

সেই কৌমুদী স্নাত মূর্ত্তির শোভা দেখিয়া উভয়েই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া অতৃপ্ত নয়নে দাঁড়াইয়াছিল। তাজের গম্বুজের উপরে কোনও কোনও প্রস্তরকণা চন্দ্রকরসম্পাতে যেন এক এক বার বৈদ্যুতিক আলোকে সঞ্চালিত হীরকখণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে দৃশ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে উভয়েরই মন উঠিতে ছিল না। রাত্রি প্রহরেক অতীত হইলে জ্যোৎস্না সহসা অজয়ের দিকে চাহিয়া দেখে অজয়ের উদাস দৃষ্টি যেন তাজ ভেদ করিয়া কোন দূর দূরান্তরে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। জ্যোৎস্না ডাকিল, "অজয় বাবু!"—অজয়ের সাড়া নাই! শেষে তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া যখন জ্যোৎস্না ডাকিল, "অজয় বাবু—বাসায় চলুন—অনেক রাত হয়ে গেছে।" তখন যেন অজয়ের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল—সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল।

গাড়ীতে বসিয়া জ্যোৎস্না করুণা-কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অজয় বাবু, অমন করে বসে কি ভাবছিলেন—মনে কি কিছু কষ্ট হচ্ছিল?"

অজয় বিষণ্নবদনে উত্তর দিল, "কৈ-না—কষ্ট কি?" জ্যোৎস্নার কিন্তু সে উত্তরে প্রত্যয় হইল না—তাহার করুণ-দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হইয়া যেন অজয়ের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিবার জন্য গাড়ীর অভ্যন্তরের আধ আলো আধ ছায়ায় জ্বলিতে লাগিল।

আর একদিন তাহারা উভয়ে ফতেপুর-সিকরিতে আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী দেখিতে গিয়াছিল। ধরণীবাবুর সে দিন কোনও বিশেষ কাজ ছিল বলিয়া তিনি সঙ্গে যাইতে পারেন নাই। জ্যোৎস্না বহুদিন পূর্ব্বে একবার পিতার সহিত সেই লোহিতাভ পাষাণে গঠিত অপূর্ব্ব শোভাময় প্রাসাদ-তোরণাবলীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে আসিয়াছিল। অজয়ের সেই প্রথম দর্শন। প্রায় দশক্রোশ পথ অশ্বযানে অতিক্রম করিয়া (তখনও মোটরের আমদানী হয় নাই) দূর হইতে সিকরি-শৈলের অধিত্যকায় আকবরের খান্দেশ বিজয়ের স্মৃতি-তোরণ—ভুবন-বিখ্যাত 'বুলন্দ দরওয়াজা' দেখা যাইতে ছিল। নিকটে গিয়া শৈল-শিখরে আরোহণ করিয়া সেই বিরাট ও মনোজ্ঞ, ভারতের উচ্চতম তোরণের এবং পরিত্যক্ত নগরীর প্রাসাদ-বাজির অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া অজয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তোরণে প্রবেশ করিয়াই বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত রাজধানীর বাস্তুদেবতা সাধু সেলিমচিস্তির শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে জালিকাটা পরদা-বিশিষ্ট সমাধি মন্দিরটী, রক্তচন্দনচর্চ্চিত থালে শ্বেতপদ্মের ন্যায় শোভমান! সেই ফকির সেলিমচিস্তিরই একজন বংশধর উভয়কে পথপ্রদর্শন করিয়া প্রাসাদাবলী দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সেগুলির প্রাচীন ইতিহাস ও কিম্বদন্তী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিরূপে ফকির সেলিমচিস্তিরই বরে যা তাঁহার শিশুপুত্রের আত্মদানে

আকবর পুত্রলাভ করিয়া তাহার নাম সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর বাদসাহ) রাখিয়াছিলেন কেনই বা আকবর সেই অমরাবতী তুল্য নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রাচীন ও বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিল। পথ-প্রদর্শক প্রথমেই উভয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রাঙ্গণে সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ ও তাহার পশ্চাতে সেলিমচিস্তির যে শিশুপুত্র বাদসাহের পুত্রকামনা পূরণের জন্য আপনার প্রাণ দিয়াছিল তাহার ক্ষুদ্র কবর এবং প্রাঙ্গণের পার্শ্বের অলিন্দে আকবরের আত্মীয় ওমরাহগণের অগণ্য কবরশ্রেণী দেখাইল। পরে ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করগণের অক্ষয় কীর্ত্তি নিচয়—অশ্বশালা, হস্তীশালা, উষ্ট্রশালা, হাওয়াখানা বা পঞ্চমহল, যোধাবাইএর প্রাসাদ, সুচিত্রিত মিরিয়ম বেগমের ও সুকুমার ভাস্কর্য্য-খচিত স্তাম্বুলী বেগমের সুন্দরভবন, আবুল-ফজল, ফৈজী ও বীরবলের ভবন, বিচিত্র-গঠন 'এক-থাম্বা' বা দেওয়ানী-খাস, নগরের পশ্চাৎভাগে হস্তীতোরণ, হিরণ্‌মিনার প্রভৃতি একে একে সমস্তই দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। উভয়ে মুগ্ধনেত্রে সেই হর্ম্ম্যরাজির শোভা দেখিতে দেখিতে এবং সেগুলির স্মৃতির সহিত বিজড়িত প্রাচীন কাহিনী শুনিতে শুনিতে এরূপ একাগ্র হইয়া গিয়াছিল যে পথপ্রদর্শনকারীর অতিরঞ্জিত বা ভ্রমাত্মক বর্ণনার প্রতিবাদ বা সংশোধন করিতে অজয়ের প্রবৃত্তিই হইতেছিল না। শেষে যখন পথ-প্রদর্শক তাহাদের টঙ্কশালা

(তখনও তাহা ভূমিসাৎ হয় নাই) ও পাষাণ-স্থপতিগণের মস্‌জিদ দেখাইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল তখন উভয়ের সময়ের গতির প্রতি লক্ষ্য পড়িল। তখন সন্ধ্যা তাহার শ্যাম বাহু ধীরে ধীরে বিস্তার করিয়া সেই বিজন নগরীর উপর অন্ধকারের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেছিল। জ্যোৎস্না ব্যগ্রভাবে বলিল, "চলুন অজয়বাবু, আজ আর নয়, আর একদিন আসা যা'বে—বাসায় ফির্‌তে দেখ্‌ছি অনেক রাত্রিহয়ে যা'বে।"

পথ প্রদর্শককে পুরস্কার দিয়া গাড়ীর অনুসন্ধানে আসিয়া উভয়ে অনুচরের মুখে শুনিল, গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেখানে আর গাড়ী পাইবার উপায় নাই। গাড়োয়ান তাহার অশ্বদ্বয়কে লইয়া আগ্রায় ফিরিয়া গিয়াছে—প্রত্যুষে অন্য গাড়ী লইয়া আসিবে। অজয়ের কথা শুনিয়া জ্যোৎস্নার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ভীতস্বরে কহিল, "তাহ'লে ত দেখ্‌ছি ভারি বিপদ—এখানে রাত্তিরে থাক্‌ব কি করে ?" মসজিদের মাতোয়ালী তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আশ্বাস দিল—ভয়ের কোনও কারণ নাই, থাকিবার ডাকবাঙ্গলা আছে, খাবারের দোকান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু সে কথায় জ্যোৎস্নার কিছুমাত্র উদ্বেগ কাটিল না, সে ভীতিকাতর-স্বরে কহিল—"এ জায়গায় কি রাত্রে থাকা যায় !"

জ্যোৎস্নার মুখের ভয়ার্ত্তভাব লক্ষ্য করিয়া সহসা অজয়ের মগ্নচৈতন্য যেন সাড়া দিয়া উঠিল—সে গভীর আশ্বাসে

বলিয়া উঠিল, "ভয় কি জ্যোৎস্না! আমি ত কাছে আছি?"

অজয়ের সান্ত্বনা-বাক্যে জ্যোৎস্না কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইল এবং অনন্যোপায় হইয়া অজয়ের সহিত প্রাসাদশ্রেণীর বহির্দ্দেশে তৎকালে ডাকবাঙ্গলারূপে ব্যবহৃত একটা কক্ষে আশ্রয় লইল। বাজার হইতে আনিত খাদ্যদ্রব্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, জ্যোৎস্না সেই কক্ষের মধ্যে শয়ন করিল—নিকটেই অজয় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিল। পরিচারক মাতোয়ালীর নিকট হইতে একখানি খাটিয়া আনিয়া সেই কক্ষের বারান্দায় শয়ন করিল।

এতদিন অজয়কে শিশুভাবাপন্ন—তাহারই উপর নির্ভরশীল—জানিয়া জ্যোৎস্না অজয়ের সহিত অবাধে—নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে ও একত্র অবস্থান করিতে মনের মধ্যে কোনও দিন বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনুভব করে নাই। কিন্তু সে দিন সেই শঙ্কটকালে যখন অজয়ের অন্তরাত্মা সহসা পরিচয় দিল যে সে পুরুষ—জ্যোৎস্না তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে, তখন হইতে জ্যোৎস্নার মনে কেমন যেন একটা কুণ্ঠা আসিয়া পড়িল—অজয়ের সহিত নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক কক্ষে রাত্রি যাপন করিতে তাহার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। অজয়ের সহিত সহজ ভাবে কথোপকথন করিয়া, সেই সঙ্কোচের ভাব গোপন করিতে গিয়া, সে যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল—তাহার

বাক্যের জড়তা, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক উচ্চতা, তাহার মনের প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচ যেন স্পষ্টতর করিয়া জানাইয়া দিতে লাগিল। অজয়ের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সমস্ত দিবস ভ্রমণের পর ক্লান্ত হইয়া সে অচিরে তন্দ্রাক্রান্ত হইল। কিন্তু জ্যোৎস্নার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। সেই জনশূন্য নগরীর বিরাট স্তব্ধতা যেন গুরুভারে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের উপরআসিয়া চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ বিনিদ্রনয়নে ভীত চকিত অবস্থায় যাপন করিবার পরে, শেষে তাহার নিদ্রাবেশ আসিল। কিন্তু সেই সুষুপ্তি শান্তি না আনিয়া স্বপ্ন-বহুল হইয়া তাহাকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না স্বপ্নে দেখিল যেন সিকরিশৈলের শিখরে ও সানুদেশে সেই অভ্রচুম্বিতচূড় বিরাট তোরণের ও পাষাণ-প্রাসাদরাজির চিহ্ন মাত্র নাই। সাধু সেলিমচিস্তির কুটীর-প্রাঙ্গণে সেই ঈশ্বরজানিত ফকিরের সমক্ষে নতজানু হইয়া জোড়করে আজানুলম্বিত-বাহু স্বয়ং বাদসাহ আকবর ও তাঁহার রাজপুত মহিষী যোধাবাই ফকিরের নিকট একটী দীর্ঘায়ু পুত্রসন্তানের প্রার্থনা করিতেছেন। যেন ফকির তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতেছেন—'সকলি খোদার ইচ্ছা, আমি সামান্য মানব—খোদার দাসানুদাস, আমি কি করিতে পারি ?' যেন নিকটে উপবিষ্ট ফকিরের শিশুপুত্র, বয়স্কব্যক্তির মত, পিতাকে বলিতেছে, 'বাবা, বাদসাকে ভুলাইওনা—তুমি কি

ইচ্ছা করিলে বাদসার কামনা পূর্ণ করিতে পার না?' সাধু যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিশুপুত্রের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য-বিকসিত অধরে সেই অদ্ভুত শিশুকে বলিতেছেন, 'বৎস—তোমার সাহজাদা হবার ইচ্ছে হয়েছে? আচ্ছা, তাই হো'ক, তুমিই বেগমের গর্ভে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর।' যেন সাধুর মুখ হইতে সেই কথা নিঃসরণ হইতে না হইতে, শিশুর প্রাণহীন দেহকমল সাধুর পদপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িল। যেন সাধু নির্ব্বিকার—কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গের গগনভেদী আর্ত্তনাদে শিকরির বিজন অধিত্যকা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন দেখিতে দেখিতে অদূরে সেই সমুন্নত তোরণ সমন্বিত বিরাট শ্মশান-প্রাঙ্গণ ভূমিতল ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল এবং প্রাঙ্গণের বারান্দায় সমাধিস্থ প্রত্যেক কবর হইতে আমীর-ওমরাহগণ উত্থিত হইয়া শোক-কম্পিত-কণ্ঠে আল্লার নাম উচ্চারণ ও মুক্তবক্ষে করাঘাত করিতে করিতে আসিয়া মৃতশিশুকে সমাধিস্থ করিতে লইয়া চলিল। তাহাদের মর্ম্মস্পর্শী শোকধ্বনি শুনিয়া যেন জ্যোৎস্নার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সে কাঁদিতে পরিতেছে না, এমন সময় কে যেন আসিয়া সেই কক্ষের রুদ্ধ কপাটে আঘাত করিতে লাগিল। স্বপ্নভঙ্গে ত্রস্তভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে জ্যোৎস্না ডাকিল, "অজয় বাবু! অজয় বাবু!!"

অজয় সুপ্তোত্থিত হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

"জ্যোৎস্না ডাকছ ? কেন ? কি হয়েছে ?" এমন সময়ে বাহিরের কপাটে আঘাত শুনিয়া অজয় দ্বার খুলিয়া দিয়া দেখে ধরণীবাবুর আগ্রা আপিসের দ্বারবান রামভজন প্রদীপ্ত লণ্ঠন হস্তে দণ্ডায়মান।

রামভজনের মুখে অজয় ও জ্যোৎস্না শুনিল যে গাড়োয়ান আগ্রায় গিয়া গাড়ীর চাকা ভাঙ্গার সংবাদ ধরণীবাবুকে দিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র গাড়ী করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইতে রামভজনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের বিলম্ব হওয়াতে ধরণীবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় গাড়োয়ান গিয়া দুর্ঘটনার কথা বলে। তখনও তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাদের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া আছেন। ধরণীবাবুর বন্ধুবর্গ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে চিন্তার কোনও কারণ নাই— সেখানে থাকিবার স্থান আছে, সঙ্গে লোক আছে ইত্যাদি, কিন্তু ধরণীবাবু সে কথায় আশ্বস্ত না হইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রাত্রি দুইটার সময় অজয় ও জ্যোৎস্না আগ্রায় ধরণীবাবুর দারাগঞ্জের বাসায় গিয়া পৌছিল। ধরণীবাবু ও তাঁহার তিন চারিজন বন্ধু ও কর্ম্মচারী গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই সদরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ধরণীবাবু অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নার হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া কহিলেন, "আয় মা আয়, কি ভাবনাই আমার হয়েছিল ? একলাটী সেই পোড়ো জায়গায় রাত্তিরে থাকা কি সহজ কথা ?"

রামভজন কোচবাক্স হইতে নামিয়া ধরণীবাবুকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, "মহারাজ আপনি খ্যামকা ব্যস্ত হচ্ছিলেন —জামাইবাবু কাছে ছিলেন—দুজনে বেশ ঘুমুচ্ছিলেন।"

রামভজনের কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত চমকিত হইয়া উঠিল।

ধরণীবাবুও অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "জামাইবাবু নন—অজয় বাবু।"

ধরণীবাবুর একজন আগ্রাবাসী বন্ধু কিছু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কি আপনার জামাতা—ন'ন ?"

ধরণীবাবু সেই প্রশ্নে অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "না—আমার আশ্রি—আত্মীয়।"

অজয় সেই কথোপকথনে মনোযোগ দিল না—কিন্তু জ্যোৎস্নার আননে যেন একটা শঙ্কার ছায়া আসিয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন হইতে জ্যোৎস্না অজয়ের সহিত পূর্ব্বের মত অবাধে সদাসর্ব্বদা একত্র থাকা বন্ধ করিল। ধরণীবাবু সঙ্গে না থাকিলে অজয়ের সহিত সে আর কোথাও বেড়াইতে যাইত না, অজয় বলিলেও কোনওরূপ ওজর করিয়া কাটাইয়া দিত। পূর্ব্বে জ্যোৎস্নার আগ্রহেই অজয় তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত, নতুবা সে গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পাইলে যেন আর কিছু চাহিত না। এক্ষণে জ্যোৎস্নার বাহিরে যাইবার অনুরোধ না থাকায় অজয় গ্রন্থপাঠে এতই মনঃসংযোগ করিল যে জ্যোৎস্নার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্যই করিল না।

অজয় পূর্ব্ব-অভ্যাস মত, কোনও গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলে, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহা জ্যোৎস্নাকে না বলিলে সুস্থির হইতে পারিত না। সেই হেতু যখন তখন অজয় জ্যোৎস্নার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইত বলিয়া, পিতা বাড়ীতে না থাকিলে জ্যোৎস্না তাহার গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন মধ্যাহ্ন কালে অজয় হঠাৎ জ্যোৎস্নার কক্ষের

দ্বারে আঘাত করিয়া কহিল, "জ্যোৎস্না—দরজা দিয়ে রেখেছ কেন? দরজা খোল—একটা কথা আছে।"

দ্বার খুলিতেই অজয় উৎসাহের সহিত কহিল, "দেখ, আজ একটা সন্দেহ মিটে গেল। ঔরঙ্গজীব যখন সাজাহানকে বন্দী করে, তখন সে এসে—আমি তোমাকে সেদিন যে জায়গাটা দেখিয়ে ছিলুম—ঠিক সেই খানেই ছাউনি করে!"

জ্যোৎস্না সে সংবাদে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিল না দেখিয়া, অজয় প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিবার মানসে কহিল, "দেখ, আমাদের ত এখান থেকে যাবার দিন কাছে এল, কই—রামবাগ দেখ্‌তে গেলে না?"

কয়েকদিন পূর্ব্বে জ্যোৎস্না রামবাগ দেখিতে লইয়া যাইবার জন্য অজয়ের নিকট ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল।

জ্যোৎস্না অন্যমনস্কভাবে কহিল, "আচ্ছা বাবাকে বল্‌ব।"

জ্যোৎস্নাকে নিরুৎসাহ দেখিয়া অজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

পরদিন ধরণীবাবুকে সঙ্গে লইয়া জ্যোৎস্না অজয়ের সহিত যমুনার নৌ-সেতু পার হইয়া বাদসাহদিগের প্রাচীন উদ্যান রাম-বাগে বেড়াইতে যাইল। সেখানে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ধরণী বাবু একটী বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহার সহিত বিষয় কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অজয় জ্যোৎস্নাকে লইয়া উদ্যানের নানাস্থান দেখাইয়া বেড়াইতে

বেড়াইতে প্রাচীন কালের চিত্র মনশ্চক্ষে কল্পনা করিয়া জ্যোৎস্নার নিকট বর্ণনা করিতে লাগিল। ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে একটী পয়ঃপ্রণালীর ও জলাধারের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অজয় জ্যোৎস্নাকে বলিতেছিল, এখন এই ভগ্ন-উৎসের দিকে আর কেহ চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু এক সময়ে হয়ত সেই কৃত্রিম জলস্রোতে কত ইরাণী সুন্দরী তাহাদের মেহেদী-রাগ-রঞ্জিত বাতুল চরণ বিধৌত করিত, কত নর্ত্তকীর স্বুবর্ণ শিঞ্জিনি সেই পয়ঃপ্রণালীর আলিসার উপর অণুরণিত হইত—সেই জলাধারের সলিল-দর্পণে মোগল অন্তঃপুরের কত বিলাস-বিভ্রমের চিত্র প্রতি-বিম্বিত হইত। সেই বিলাসের পাপেই বুঝি মোগলের গৌরব বিলুপ্ত—তাহাদের ঐশ্বর্য্য হতশ্রী—উদ্যান বাটিকা শ্মশানে পরিণত। জ্যোৎস্না তন্ময় হইয়া অজয়ের সেই সকল কথা শুনিতেছিল এবং অজয়ের বাক্যে ক্রমে একটা আবেগ আসিয়া পড়িতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় সে দেখিল একজন আগ্রাপ্রবাসী বাঙ্গালীযুবক অপর একটী বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে সেই স্থান দিয়া তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া চলিয়া গেল। প্রথমোক্ত যুবকটী ওকালতী করে—সে একবার জ্যোৎস্নার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু ধরণী বাবু সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। সেই যুবকের চাহনীতে একটা কুটিল ভাব লক্ষ্য করিয়া জ্যোৎস্না কিছু বিচলিতভাবে অজয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী, ধরণীবাবু যেদিকে

বসিয়া ছিলেন সেই দিকে যাইতে লাগিল। অজয় বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ চলে এলে যে? ওদিকে আরো কত কি দেখবার জিনিস আছে।"

জ্যোৎস্না উদ্বিগ্নভাবে উত্তর দিল, "তা থাকুক্‌গে—এদিকে আসুন—পা ব্যথা হয়ে গেছে—এই মেদীগাছের বেড়ার ধারে একটু বসি।"

জ্যোৎস্নার আহ্বানে অজয় তাহার অল্পদূরেই সেই ছায়া-শীতল শষ্পাসনে বসিল। সেই সময়ে বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে দুইজন ব্যক্তির কথোপকথন শুনিয়া জ্যোৎস্না উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ মেয়েটীর সঙ্গেই না তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল? তা হ'লো না কেন?"

উত্তর হইল, "ও মেয়ে বিয়ে কর্‌বে না—চিরকুমারী থাক্‌বে।"

প্রথমব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি? চিরকুমারী ত থাকবেন—কিন্তু সঙ্গে মাণিকজোড়টী কে?"

উত্তর হইল, "সব দিকে অত নজর কেন হে? ভারি অসভ্য ত!"

উত্তর হইল, "তা বটে" এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের কৌতুক হাস্যের লহর উঠিল।

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই জ্যোৎস্না বুঝিতে পারিয়াছিল যে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী যুবকদ্বয় তাহারই কথা কহিতেছে। সেই

কথোপকথনের কদর্য্য ইঙ্গিতে জ্যোৎস্নার মুখমণ্ডল ঘৃণায় আরক্তিম হইয়া উঠিল—সে কোনও কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

অজয় একাগ্র হইয়া মোগলদিগের প্রাচীন কথাই ভাবিতেছিল, যুবকদের বাক্যে কাণ দেয় নাই। জ্যোৎস্নাকে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে দেখিয়া অজয়ও উঠিয়া তাহার অনুগমন করিল। জ্যোৎস্না ধরণীবাবুর কাছে গিয়া বলিল, "বাবা বাড়ী চলুন—আমার মাথা ধরেছে—আর বেড়াতে পারছি না।"

ধরণীবাবু অনুযোগের স্বরে সস্নেহে কহিলেন, "রোদে গিয়েছিলে বুঝি মা? মাথায় রোদ লাগাতে আছে কি? চল বাড়ী যাই।"

সেই দিন হইতে জ্যোৎস্না পিতার অনুপস্থিতিতে অজয়ের সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন করাও ত্যাগ করিল। কিন্তু যাহাতে অজয়ের আহারাদি বিষয়ে কোনওরূপ অসুবিধা না হয়—সে দিকে পূর্ব্বের মত দৃষ্টি রাখিল।

অজয়ের কিছু প্রয়োজন হইলেই জ্যোৎস্নাকে ডাকিয়া পাঠাইত, কিন্তু জ্যোৎস্না নিজে না গিয়া অজয় যাহা চাহিত তাহা লোকহস্তে পাঠাইয়া দিত। অন্য কোনও কারণে ডাকিলে জ্যোৎস্না একটা কিছু ওজর করিয়া অজয়ের নিকটে যাইত না।

একদিন অপরাহ্নকালে জ্যোৎস্না ছাদের উপর ম্লানমুখে

দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে অদূরস্থ মসজিদের শিখরে শিখরে অস্তমান তপনের শেষ-রশ্মির বিদায় অভিবাদন দেখিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অজয় আসিয়া ডাকিল, "জ্যোৎস্না।"

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া বলিল, "আপনি এখানে এসেছেন কেন?"

অজয় ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর দিল, "এসেছি তাতে দোষ কি জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আপনি তা বুঝ্‌বেন না—নেমে যা'ন।"

অজয় করুণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া গেল। অজয়ের কাতর দৃষ্টির মৌন ভৎর্সনা জ্যোৎস্না তাহার সমক্ষে অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিল। কিন্তু অজয় নামিয়া যাইতেই জ্যোৎস্নার সে বাহ্যিক স্থৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল, কি যেন এক দারুণ ব্যথায় তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—অজয় যে দিক দিয়া নামিয়া গিয়াছিল সেই দিকে সে বহুক্ষণ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পর দুই দিন অজয় ও জ্যোৎস্নার দেখা হইল না—উভয়ের কেহই সাক্ষাৎ করিবার কোনও চেষ্টা করিল না। অজয় অভ্যাস মত পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে বসিত, কিন্তু পাঠে

মনঃসংযোগ দিতে পারিল না, বাহিরেও বেড়াইতে যাইল না—উদাস-দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দুইটী দীর্ঘ দিন কাটাইয়া দিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না, সে কি অপরাধ করিয়াছে—নতুবা যে জ্যোৎস্না এতদিন অযাচিত স্নেহকরুণার সুস্নিগ্ধ প্রস্রবণে তাহাকে অহরহঃ স্নাত করিয়া রাখিত, সে সহসা এরূপ বিরূপ হইল কেন? হয়ত না জানিয়া সে তাহার কাছে কোনও অন্যায় করিয়াছে, কিন্তু সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধের কথা জ্যোৎস্না তাহাকে বলিয়া দিল না কেন? সেই অভিমানে অজয় জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিল না।

অজয়ের মনের ভাব জ্যোৎস্না যে বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে কিন্তু অজয়ের মনঃকষ্টে জ্যোৎস্না তৎকালে যেন একটা উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেছিল। অজয়কে নিঃসহায় ও জ্যোৎস্নার উপর নির্ভরশীল ভাবিয়াই জ্যোৎস্না তাহাকে যত্ন-আদর করিতেছিল, তাহার ফলে কিনা লোকচক্ষে আজ অজয় এতই শক্তিমান হইয়া উঠিল যে তাহার সাহচর্য্যে আজ জ্যোৎস্নার সুনামে কলঙ্ক আসে? দুষ্ট লোকের অপবাদে জ্যোৎস্না ভ্রুক্ষেপ করে না,—কিন্তু লোকে যে ভ্রমেও সেরূপ ভাবিতে পারে, অজয়ের সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ জ্যোৎস্না কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তাই জ্যোৎস্না নিজের মনে যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিল তাহার প্রতিঘাত-স্বরূপ অজয়ের মনে ব্যথা দিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার আত্মাভিমান রক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু স্বভাবতঃ করুণহৃদয়া জ্যোৎস্না তাহার সেই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্বে শেষে নিজেই পরাস্ত হইল। সে অজয়ের ম্লান-মুখের কাতরদৃষ্টি—অভিমানের মৌন তিরস্কার—দুইদিন উপেক্ষা করিবার ভাণ করিয়া শেষে বুঝিতে পারিল, এবং বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল, যে অজয়ের মনে ব্যথা দিলে অজয় তাহাকে ততোধিক ব্যথা দিতে পারে—সে শক্তি অজয়ের সত্য সত্যই হইয়াছে। ইহা দুষ্টলোকের হীন ইঙ্গিত নহে—নির্ব্বোধের ভ্রম নহে—ইহা অকাট্য সত্য—জ্যোৎস্নার অন্তরের অন্তরে সে সত্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বিরাট হইতে বিরাটতর হইয়া উঠিতেছে—সে সত্য চাপিয়া রাখিবার নহে—জ্যোৎস্না অজয়কে ভালবাসে! একি দীনতা? একি হীনতা? একি পুরুষের গর্ব্বিত মোহিনী-শক্তির নিকট নারী-হৃদয়ের পরাজয়? তাহা হইলে এ দুর্ভাগ্য তাহার কেন হইল? জ্যোৎস্না ক্ষোভে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল—সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল তাহার সে দৌর্ব্বল্য অজয়কে সে কিছুতেই জানিতে দিবে না—পুরুষকে সেরূপ প্রশ্রয় সে কিছুতেই দিবে না।

অজয়ের কিন্তু সেরূপ কোনও উচ্চাভিলাষ বা দুরভিসন্ধি ছিল না—সে আপনাকে জ্যোৎস্নার সহিত তুলনায় অতি দীন ভাবিত—সে যে জ্যোৎস্নার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তাহার মনঃক্লেশ। দিনের মধ্যে শতবার তাহার মনে হইতেছিল—একবার জ্যোৎস্নার কাছে গিয়া সে স্পষ্ট

থাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু অভিমান তাহাকে যাইতে দিতে ছিল না সে উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না। ক্রমে জ্যোৎস্না তাহা বুঝিতে পারিল। অজয়ের বিরসবদন ও কাতরলোচন জ্যোৎস্নাকে জানাইয়া দিল—পরাজয় বুঝি তাহার নহে—পরাজয় অজয়েরই—ভালবাসার ক্ষেত্রে নারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার অন্তরাত্মার অব্যক্ত ভাষা তাহাকে বলিয়াদিল—ভালবাসার দৌর্ব্বল্যে হীনতা নাই—এ যে আত্মার অপূর্ব্ব আহ্লাদ—নরনারীর হৃদয়ে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। অন্তরে ইহা বুঝিয়াও কিন্তু জ্যোৎস্না বাহিরে তাহা স্বীকার করিল না--সে অজয়কে দূরে দূরেই রাখিল।

এদিকে ধরণীবাবুও তাহাদের ব্যবহারের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উভয়ের অবাধ প্রীতি-স্নেহ-সম্ভাষণের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা কি অন্তরায় আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনিও কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। ফতেপুরসিকরি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের রাত্রে তাঁহার আপিসের দ্বারবান যে অজয়কে তাঁহার জামাতা বলিয়া ভ্রম করে, সেই ভ্রমের জন্য তৎকালে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত লক্ষপতির কন্যার সহিত অজয়ের মত নিরুপায় ও নিঃস্ব ব্যক্তির বিবাহ হইয়াছে লোকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি তৎকালে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা তাঁহার

মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল—তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যখন তখন সময়ে অসময়ে কথাটা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে গভীর চিন্তায় মগ্ন করিত। তিনি এক একবার ভাবিতেন যে অজয় নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় হইলেও অপর কোন বিষয়েই তাচ্ছিল্যের পাত্র নহে—প্রত্যুত রূপে-গুণে সে প্রকৃতই একজন সুপাত্র। সে ধীরপ্রকৃতি, বিবেচক ও বিদ্বান এবং জ্যোৎস্নাকে সে শ্রদ্ধা করে। আর জ্যোৎস্নাও তাহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করে বোধ হয় অপর কোনও যুবককে সেরূপ শ্রদ্ধা সে জীবনে করে নাই। সুতরাং উভয়ের যদি বিবাহ হয় তাহাতে ক্ষতি কি? তবে জ্যোৎস্না বিবাহ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছে—সেই সঙ্কল্প সে কি ভাঙ্গিবে? কিন্তু অপরাপর পাত্রের বিষয়ে জ্যোৎস্না যে আপত্তি করিত অজয়ের পক্ষে ত সে সকল আপত্তি খাটে না। অর্থের উপর যে অজয়ের কিছুমাত্র লোভ নাই তাহা স্থির এবং যদি সে জ্যোৎস্নাকে ভালবাসে তাহা হইলে তাহাকে জ্যোৎস্না বলিয়াই ভালবাসিবে—তাঁহার ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নহে। ধরণীবাবুর মানব চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে একথা তিনি হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন।

অজয়ের ধন সম্পত্তি নাই তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—কেননা তাঁহার যে অর্থ আছে তাহা তাঁহার কন্যা ও জামাতার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু প্রধান আপত্তি এই যে অজয়ের পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা নাই। কিন্তু সে আপত্তি করিতে গেলে—

জ্যোৎস্নার বিবাহের আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হয়; জ্যোৎস্না যে আর কখনও কোন ব্যক্তিকে অজয়ের মতন শ্রদ্ধা করিবে, তাহা দুরাশামাত্র। শেষে ধরণীবাবু স্থির করিলেন, অজয়কে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেই হইবে কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি একবার উভয়ের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ সুখশান্তির জন্য সে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

জ্যোৎস্না ও অজয়ের ছাদে সাক্ষাৎ হইবার কয়েক দিন পরে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ধরণীবাবু তাঁহার বিরাম কক্ষে অজয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিকটেই জ্যোৎস্না পূর্ব্ব হইতে আসিয়া বসিয়াছিল।

ধরণীবাবু অজয়কে বলিলেন, "আমাকে একবার লক্ষ্ণৌএ ফিরে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে কাশীতে যা'ব বলেছিলুম তা এখন আর হলো না, তোমাকে একলাই যেতে হবে—আমি সঙ্গে লোক দেব।"

অজয় আনত-বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যোৎস্নাও যাবে না না কি?"

ধরণীবাবু কহিলেন, "হাঁ, জ্যোৎস্না আমার সঙ্গেই যাবে।"

অজয় বিমর্ষভাবে উত্তর দিল, "তা হ'লে আমি না হয় এখন কাশীতে নাই গেলুম। জ্যোৎস্নাও যদি না যায় তাহলে আমি একলা সেখানে গিয়ে কি করব?"

ধরণীবাবু তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আমি না গেলে—জ্যোৎস্না তোমার সঙ্গে কি করে যাবে বাবা? লোকে যে নিন্দে করবে।"

অজয় বিস্মিত ভাবে কহিল, "নিন্দে করবে—কার? জ্যোৎস্নার? কেন?"

ধরণীবাবু কহিলেন, "তুমি যে আমাদের কত আপনার লোক হয়ে গেছ—তা'ত লোকে বুঝ্‌বে না? লোকে জানে তুমি নিঃসম্পর্কীয়—আর জ্যোৎস্না অবিবাহিতা।"

অজয় চমকিয়া উঠিয়া দুঃখিত ভাবে কহিল, "তা হ'লে—থাক।"

ধরণীবাবু কহিলেন "তুমি সে জন্যে দুঃখ কোরো না—লোকে যাই বলুক, আমরা তোমাকে পর ভাবিনা—তবে সমাজে থাক্‌তে হলে—"

অজয় বিচলিত ভাবে কহিল, "না না সে জন্যে আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। জ্যোৎস্নার নিন্দা হ'বে—এমন কিছু—আপনি অনুমতি দিলেও আমি কর্‌ব কেন? যা হ'তে আমি পুনঃর্জীবন পেয়েছি বল্‌লে হয়—তা'র যে কখনও কিছু প্রতিদান দিতে পার্‌বো সে আশা ত নেই—তা'র অনিষ্ট হ'বে এমন কাজ করব—বলেন কি? বুঝ্‌তে পারিনি বলেই ওকথাটা বলেছিলুম—ক্ষমা করবেন।"

অজয়ের মুখের গভীর ক্ষোভ ও আত্মগ্লানির সুস্পষ্ট লক্ষণ

দেখিয়া ধরণী বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "তবে—একটা উপায় আছে—যা'তে তুমি যেমন আমাদের কাছে সত্যসত্যই আপনার জন হয়েছ—তেমনি লোকের চক্ষেও তোমাকে আপনার করে নিতে পারি—কিন্তু সেটা ঠিক আমার মতামতের উপর নির্ভর করছে না—সেটা তোমার আর জ্যোৎস্নার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করছে—"

অজয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ইচ্ছার উপর?"

ধরণীবাবু বলিলেন, "হাঁ—তোমাদের উভয়েরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তোমাদের যদি বিবাহ হয়—তাহ'লে তোমাকে সত্য সত্যই পুত্রস্থানীয় করে নিতে পারি।"

অজয় চমকিয়া উঠিল, কিন্তু স্বতঃই তাহার মুখমণ্ডল একটা প্রীতির প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ধরণী বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি সুপাত্র আর জ্যোৎস্নাকেও তুমি স্নেহ-শ্রদ্ধা কর, কেবল এক বাধা এই যে তোমার পূর্ব্ব-পরিচয় জানা নেই—হয়ত তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে মিলন হলে—এমন অবস্থায় তুমি পড়তে পার, যা'তে এখন তুমি জ্যোৎস্নাকে যেমন স্নেহ-শ্রদ্ধা কর, তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।"

অজয় আত্মদমনে অশক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বলেন কি? জ্যোৎস্নার ওপর আমার স্নেহ-শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম হবে!"

ধরণী বাবু অজয়ের সরল বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, "তা হ'লে তোমার এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি নেই দেখ্‌ছি।"

অজয়ের মৌনদৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। ধরণীবাবু প্রীত হইয়া জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে অধোবদনে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে।

ধরণী বাবু তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কি বল মা?—তোমার মনের কথা কি তা জানি না, তবে এই বল্‌তে পারি, যে সব কারণে অন্য পাত্রদের বিবাহ কর্‌তে তোমার আপত্তি ছিল—অজয় বাবুর পক্ষে সে সব আপত্তি খাটেনা—নয় কি? কি বল?"

জ্যোৎস্না মুখ তুলিতেই দেখিল অজয় মিনতিপূর্ণ-কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—সে দৃষ্টিতে দাম্ভিক আত্মগরিমার দাবী নাই, দীনের প্রার্থনা জাজ্বল্যমান। সেই কাতরদৃষ্টি জ্যোৎস্নাকে বিকল করিল। তাহার হৃদয়ের অনিবার্য্য আহ্বান, বরপণে-ঘৃণা-সঞ্জাত পুরুষ-বৈরীভাবকে বিদূরিত করিল—লাজ-নম্র স্নিগ্ধ-সুষমায় তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল।

ধরণীবাবু জ্যোৎস্নার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনের আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তা হলে বিবাহের দিন স্থির করিগে - লক্ষ্ণৌএ গিয়েই

বিবাহ দেবো।" এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া পুনর্বার বলিলেন —"আমি আজ যে কত সুখী হলেম তা বলতে পারি না। এখন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, তিনি আজ আমাকে যেমন সুখী করলেন, তেমনি তোমাদেরও যেন চিরসুখী করেন।"

ধরণীবাবু বাহিরে যাইতেই জ্যোৎস্নাও উঠিয়া যাইতেছিল। অজয় কিন্তু তাহার হৃদয়ের অপ্রত্যাশিত আনন্দ গোপন রাখিতে পারিল না—সে জ্যোৎস্নার শ্লথ হাত খানি নিজের করে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আর ভয় কি জ্যোৎস্না? এই ভয়ে তুমি কাছে আসতে না—তা বুঝতে পারিনি—কিছু মনে কোরো না।"

অজয়ের সংসারে অনভিজ্ঞতা-সূচক সরল উক্তিতে জ্যোৎস্নার মুখের কয়দিনের অন্তর্দাহের অপ্রসন্নতা কাটিয়া গেল—সে মৃদুহাস্য-চপল-নয়নে একবার অজয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখমণ্ডলে অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ অকপটে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সেই সপ্তাহেই ধরণীবাবু সপরিবারে লক্ষ্ণৌএ ফিরিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পর সপ্তাহেই বিবাহের দিন স্থির হইল।

রেলগাড়ী সংঘর্ষের পর অজয়ের পকেটে প্রাপ্ত যে টাকা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ ধরণীবাবুকে দিয়াছিলেন, অজয় আরোগ্য হইলে ধরণীবাবু তাহা অজয়কে প্রত্যর্পণ করেন। অজয় সেই

টাকা এতদিন জ্যোৎস্নার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। ধরণীবাবু যে সময়ে জ্যোৎস্নার বিবাহের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে ছিলেন সেই সময়ে একদিন অজয় জ্যোৎস্নার নিকট হইতে সেই টাকা চাহিয়া লইল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা কি হ'বে?" অজয় কেবল মৃদুহাস্য করিল—কোন উত্তর দিল না।

বিবাহের পূর্ব্বদিন অজয় একছড়া স্বর্ণের হার ও একটী লকেট আনিয়া জ্যোৎস্নার হস্তে দিয়া বলিল—"আমার ত আর নিজের কিছুই নেই—এই টুকু দিলুম।" জ্যোৎস্না দেখিল, লকেটের এক পার্শ্বে এনামেল্ করা ছবি—তাজের উপর চন্দ্রোদয় হইয়াছে, অপর পার্শ্বে শুক্লাপঞ্চমীর চন্দ্রাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরকত-খচিত ক্ষেত্রে মুক্তার অক্ষরে লেখা—"জ্যোৎস্নাময়ী"। জ্যোৎস্না সেই হার ও লকেট কণ্ঠে পরিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া পিতাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিল।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

জ্যোৎস্নার বিবাহে ধরণীবাবু মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিলেন কিন্তু আমোদ উৎসবের সমারোহ অপেক্ষা দীন দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্রাদি বিতরণেই অধিক অর্থ ব্যয় করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর, অজয়ের আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানের জন্য কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইবার কথাটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সে কথা অজয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে ধরণীবাবুর প্রবৃত্তি হইত না এবং অজয় নিজেও সে কথার পুনরুত্থাপন করে নাই; অজয়ের সমস্ত হৃদয়ই তখন জ্যোৎস্না-গত হইয়া গিয়াছিল. অতীত চিন্তা করিবার তাহার তখন অবসরই ছিল না, জ্যোৎস্নার অবাধিত প্রীতি-মন্দাকিনী-স্নিগ্ধ বর্ত্তমানই তাহাকে তৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং জ্যোৎস্নাও অজয়কে তদগতপ্রাণ ও সুখী দেখিয়া, সেই সুখের স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল।

এইরূপে মাসেক কাল কাটিয়া যাইবার পর অজয় একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরণীবাবুকে বলিল, "আপনি বিষয় কর্ম্মে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন, আমি কি কোন রকমে আপনার পরিশ্রমের লাঘব করতে পারি না? এ রকম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার চেয়ে, কিছু কাজ করতে পেলে বোধ হয় ভাল হয়।"

ধরণীবাবু কহিলেন, "সে কথাটা আমার মনে উঠেছিল, কিন্তু পাছে তুমি কিছু মনে কর বলে বলিনি। উপার্জ্জন করবার ত তোমার দরকার নেই—আমার যা' কিছু আছে সমস্তই ত

তোমাদের। তবে আমার অবর্ত্তমানে যা'তে কাজটা চালাতে পার, এ রকম শিখে রাখা দরকার। তোমার নিজেরও যখন সেই ইচ্ছে হয়েছে—তখন কাল থেকে আমার সঙ্গে বেরিও—লেখা পড়া কাজে তুমি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।"

সেই কথানুযায়ী ধরণীবাবুর সহকারী ভাবে কিছুদিন কাজ কর্ম্ম করিয়া অজয় এরূপ কর্ম্মপটুতার ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিল যে ধরণীবাবু ক্রমশঃ অজয়ের উপর বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধানের অধিকাংশ ভারই অর্পণ করিলেন এবং মাসত্রয় পরে একদিন অজয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এর মধ্যে কাজকর্ম্ম যে রকম শিখে নিয়েছ—তা'তে এখন তুমি নিজেই বেশ কাজ চালাতে পারবে। এইবার লেখাপড়া করে তোমাকে অংশীদার করে নেবো মনে করেছি। আমার সমস্ত সম্পত্তিই জ্যোৎস্নার নামে উইল করা আছে—এর পরে কারবারটা তোমার নামে লিখে দেবো।"

অজয় বিস্মিত স্বরে কহিল, "আমার নামে! আমার নামে কেন? জ্যোৎস্নার থাকলেই আমার রইল। আপনি একদিন নিজেই বলেছিলেন, আমি জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্নার জন্যেই ভাল-বাসি—তার ধনসম্পত্তির জন্যে নয়। কথাটা এখনো আমার কাণে বাজছে। সে কথাটা স্মরণ হ'লে আমি মনে যথার্থ ই একটা সন্তোষ পাই। সেই সন্তোষের যা'তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে

এমন কিছু আদেশ কর্‌বেন না—আপনি প্রাণদাতা—পিতার স্বরূপ—আপনাকে আর কি বল্‌ব। জ্যোৎস্নার কাজ কর্‌ছি বলেই আমার কাজ কর্ম্মে উৎসাহ, তা না হ'লে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই।"

ধরণীবাবু সে কথার আন্তরিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সে কথার আর পুনরুত্থাপন করিলেন না।

কিছুদিন পরে ধরণীবাবু একদিন অজয় ও জ্যোৎস্নাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ অজয়, আমার ইচ্ছা করে তোমাকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, আমার আর যে যে জায়গায় কারবার আছে, সেই সেই জায়গার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দিয়ে আসি। তাহলে এর পরে মধ্যে মধ্যে তুমি গিয়ে সেখানকার খাতপত্রও দেখে শুনে আস্‌তে পার্‌বে, আর কোনও গোলযোগ হলে নিজে গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে। আমি তা'হ'লে সে সব কাজ থেকে রেহাই পাই—আর কতকটা নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি—তোমরা কি বল?"

অজয়কে মৌন দেখিয়া জ্যোৎস্না চিন্তিত ভাবে কহিল, "যখন যাওয়া দরকার—তখন যেতে হ'বে বৈকি।"

ধরণীবাবু, জ্যোৎস্নার মুখের চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া, বলিলেন, "এবারে আমরা সবাই মিলেই যা'ব—তুমিও যা'বে। পূর্ব্বে একবার আমাদের ঐ সব জায়গাতেই যা'বার কথা হয়েছিল। এবারে আগে কাশীতেই যা'ব, সেখান থেকে

কল্‌কাতায় গিয়ে ফেরবার সময় এলাহাবাদ হয়ে আস্‌ব। দিল্লীতে এর পরে আর একবার গেলেই হ'বে।"

জ্যোৎস্নার উত্তরে, তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার আভাষ পাইয়া অজয় সে প্রস্তাবে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

অজয়কে নিরুত্তর দেখিয়া জ্যোৎস্না উত্তর দিল, "বেশ, তাই হ'বে।"

সপ্তাহকাল পরেই ধরণীবাবুর সঙ্গে অজয় ও জ্যোৎস্না বারাণসীধামে যাত্রা করিল।

ধরণীবাবুর সিক্‌রোলে একটী বাসা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই বাসায় থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে অজয় ধরণীবাবুর সহিত তাঁহার আপিসে যাইয়া সেখানকার এজেন্সীর ক্ষতিলাভের হিসাব নিকাশ ও কারবারের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় গাড়ী করিয়া জ্যোৎস্নার সহিত কাশী-ধামের দর্শনীয় স্থান সমূহ ও প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রাতে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদি দেবদেবী দর্শন, অপরাহ্নে নৌকাবিহার, ও গঙ্গাতীরের প্রাসাদ মন্দিরাদির শোভা-সম্পদ দর্শন, সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন, এতদ্ভিন্ন রামনগরের রাজপ্রাসাদ, ও ব্যাসকাশীতে রাজার মন্দির ও উদ্যান, সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, ঔরঙ্গজীবের মসজিদ

সমূহ, চেৎসিংহের ভবন, মণিকর্ণিকা ও হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, মানমন্দির, অশোকের ভগ্নস্তম্ভ প্রভৃতি, প্রাচীন, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত স্থান ও মন্দিরাদি দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল তাহা অজয় ও জ্যোৎস্না উভয়েই জানিতে পারিল না। এক এক দিন উভয়ে সায়ংকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে কোনও নিভৃত স্থানে বসিয়া গঙ্গার সান্ধ্যশোভা দেখিতে দেখিতে ও পরস্পরে (অনাবশ্যকীয়) কথা কহিতে কহিতে তন্ময় হইয়া যাইত—শেষে রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উভয়ে বাসায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ীতে উঠিত।

যে দিন তাহাদের রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবার কথা, সেইদিন প্রাতে অজয় ও জ্যোৎস্না গঙ্গাস্নানের পর গাড়ী করিয়া বাসায় ফিরিতেছে, এমন সময় দেখিল পথের ধারে একটী বাটীর দ্বারে জনতা হইয়াছে—বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের সমাগম অধিক। জ্যোৎস্নার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সেই স্থানে গাড়ী থামাইয়া অজয় গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইল, যে সেখানে একজন পিশাচসিদ্ধ গণক আসিয়া আছেন—তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নখদর্পনে দেখিতে পান—তাঁহার কাছে ভাগ্য জানিবার জন্যই সেই জনতা।

সেই কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না কহিল, "চলনা ভেতরে—ব্যাপারটা কি একবার দেখে আসি?"

অজয় জ্যোৎস্নার স্ত্রীজনসুলভ কৌতূহলাধিক্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "চল।"

বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই উভয়ে দেখিল, সম্মুখেই দালানের মত একটী ক্ষুদ্র খোলা কক্ষে দৈবজ্ঞ বসিয়া আছেন। তাঁহার দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় স্ফটিকের মালা, বক্ষে যজ্ঞোপবীত, বাহুতে রুদ্রাক্ষের তাগা। তাঁহার সম্মুখের একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর তুলটকাগজের পুঁথী, এক পার্শ্বে শ্লেট ও পেন্সিল, অপর পার্শ্বে একটী সিন্দূরলিপ্ত ক্ষুদ্র ত্রিশূল গৃহতলে প্রোথিত এবং তাহার নিকটেই একটা বিকট-দর্শন নরকপাল ও একখণ্ড অস্থি। গণকঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া চেলাগণ উপবিষ্ট—তাহাদের কয়েকজন বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী তাহা নির্ণয় করা কঠিন—কিন্তু যে ব্যক্তি গণকের মুখপাত্র হইয়া কথা কহিতে ছিল সে ব্যক্তি বাঙ্গালী।

অজয় ও জ্যোৎস্না যে সময়ে সেই বাটীর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, সেই সময়ে এক ব্যক্তি গণকঠাকুরের সম্মুখে দুইটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। তদ্দর্শনে গণকঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত মুখপাত্র চেলাটী তৎক্ষণাৎ টাকা দুইটী প্রণামকারীকে ফেরৎ দিয়া কহিল, "টাকা কেন? টাকা নিয়ে যাও—এদিকে এস।" এই কথা বলিয়া সেই লোকটীকে কক্ষের বাহিরে—প্রাঙ্গণে লইয়া আসিয়া একান্তে, অথচ সকলকে শুনাইয়া বলিল,

'ওঁকে টাকা দিতে এসেছিলে কেন? উনি পিশাচসিদ্ধ—ওঁর টাকার অভাব কি?"

লোকটী টাকা দুইটী ফেরত লইয়া বলিল, "তা আর জানি নে? আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি সে কথা মনে হ'লে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—উনি রোজ ভোর রাত্তিরে শ্মশান ঘাট থেকে মড়া চড়ে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে প্রাতঃকৃত্য কর্‌তে যান!"

প্রধান চেলা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "জান ত—তবে আবার ছেলেমানুষী কর্‌তে এসেছিলে কেন? এখন যাও—কত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌ছ?"

ইতিমধ্যে গণক আর এক ব্যক্তির ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন। লোকটার হস্তের রেখা দেখিয়া গণক তাহার নিকটে পতিত অস্থিখণ্ডটা একবার নবকপালে, একবার ত্রিশূলে স্পর্শ করাইয়া, উহা তিন বার ভাগ্যপরীক্ষার্থীর মস্তকের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া এবং শেষে শ্লেটে অঙ্কপাত করিয়া, কহিলেন, "তোমার মনের কামনা পূর্ণ হবে কি না—তা এখন জানবার তোমার কোনও দরকার নাই। তোমার একটা কঠিন ফাঁড়া আছে, সেটা যদি কেটে যায় তাহলে ৩ মাস পরে আমার কাছে এস।"

লোকটী কাতরভাবে কহিল, "দোষটা কি কাটান যায় না?"

গণক বলিলেন "হাঁ, উপায় আছে বৈকি—কিন্তু তা কি তুমি করতে পারবে ?"

এমন সময় গণকের একজন চেলা দালানের ভিতর দিক হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া কাণে কাণে কি বলিল। তাহার কথা শুনিয়া গণক পূর্ব্বোক্ত ভাগ্য পরীক্ষার্থীকে কহিলেন, "আচ্ছা—আজ আর না, আর একদিন এসো।" এই কথা বলিয়া প্রধান চেলাকে ডাকিয়া তিনি চুপি চুপি কি বলিলেন। চেলা দ্রুতপদে বাহিরের দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল।

সেই সময়ে জ্যোৎস্না অজয়কে একান্তে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, যে লোকটা এই মাত্র হাত দেখিয়া দুটো টাকা দিয়ে ফেরত নিয়ে গেল, সেই লোকটাই মাথায় পাগ্‌ড়ী জড়িয়ে চেলা সেজে গিয়ে গণককে কি বল্‌ছিল—দেখেছ ?"

অজয় ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল, "হ্যাঁ দেখেছি—সেই লোকটাই বটে, এদিকে বাইরের লোক সেজে এসে হাত দেখানর ভড়ং করে, লোক ভুলিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে গণকের কাছে গিয়ে আবার চেলা হয়ে বসেছে !"

এমন সময় গণকের প্রধান চেলা একজন অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী ভদ্রমহিলা ও তাঁহার পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল, "সর সর—সব রাস্তা দাও দেখি—মা লক্ষ্মীকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই।" এই কথা বলিয়া সকলকে সরাইয়া চেলা সেই মহিলাটীকে ও তাঁহার পরিচারিকাকে গণকের সম্মুখে লইয়া

গিয়া উপস্থিত করিল। মহিলাটী রূপবতী—তাঁহার বিষাদ-ক্লিষ্ট শোক-কাতরভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই তটস্থ হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। গণকও সসম্ভ্রমে কহিল, "এস মা—বস।"

মহিলাটী জড় সড় হইয়া সেখানে উপবেশন করিতেই চেলা কহিল, "এঁর কথাই আপনার কাছে কাল নিবেদন করেছিলুম—ইনিই আজ আস্‌বেন বলেছিলেন।" মহিলাটী তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিতেই গণক অস্থিখণ্ড লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরভিনয় করিয়া কহিলেন, "একটা কুগ্রহ তোমার ওপর দৃষ্টি রেখেছে, তাই মনে এত কষ্ট পাচ্ছ।"

রমণী বসনাঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কাতরস্বরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"বলনা, গ্রহের দোষ যা'তে কেটে যায়, দয়া করে তার উপায় করে দিন্—যা খরচ লাগে তা আমি দেবো।"

গণক কহিলেন, "আমাকে কিছু দিতে হবে না—তুমি নিজেই কর্‌তে পার। কিন্তু কাজটা কঠিন—পার্‌বে কি?

রমণী পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জিজ্ঞেস করনা, কি কর্‌তে হবে?"

গণক কহিলেন, "অমাবস্যা রাত্রিতে—শ্মশানঘাট থেকে সোজা গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে একডুবে যত খানি গঙ্গা-মৃত্তিকা হাতের মুঠোতে তুল্‌তে পার তাই তুল্‌তে হবে, তারপর সেই মৃত্তিকা দিয়ে শিব গড়ে, শ্মশানে বসে সেই রাত্রেই সেই শিব

পূজা কর্‌তে হবে—একলা থাকা চাই। তার পরে সেই মৃত্তিকার শিবের মাপে স্বর্ণ-শিব তৈরী করে, সোণার বিল্বপত্র দিয়ে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা কর্‌তে হ'বে—পার্‌বে কি ?"

রমণী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "বলনা—আব কারুকে দিয়ে একাজ করাতে পারা যায় না ?"

গণক কহিলেন, "হবেনা কেন ? হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান শৈব হওয়া চাই।"

রমণী কহিল, "জিজ্ঞেস কর না ? উনি লোক ঠিক ক'রে দিতে পারেন না ?"

গণক উত্তর দিলেন, "তা পারা যেতে পারে—তবে কি না—"

রমণী কহিল, "খরচ যা লাগে তা আমি দেবো।"

গণক কহিলেন, "খরচ আর কি ? ঐ স্বর্ণের শিব, বিল্বপত্র—"

প্রধান চেলা বলিয়া উঠিল, "নন্দীর ত্রিশূল আর মহাদেবের ষাঁড়টার কথা ভুল্‌বেন না ?"

গণক তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "সে সামান্য খরচ—একটা রূপার ত্রিশূল আর একটা রূপার বৃষ—তা পঞ্চাশ ভরি রূপা হলেই হতে পার্‌বে—তবে কিনা ঐ স্বর্ণের শিব—"

রমণী তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একছড়া স্বর্ণের হার বাহির করিয়া, আনত-বদনে কহিল, "এখন এই হার ছড়া রাখুন—

৩০ ভরি গিনি সোণার আছে—আর যা লাগে তা আমি পরে পাঠিয়ে দেবো।”

চেলা বলিল, “সে জন্মে ভাবনা নেই—আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌ব।”

গণক সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন, “আবার হার ছড়া বিক্রয় করতে হবে? তা’তে গোল হ’তে পারে—”

রমণী কহিলেন, “তা হ’লে—আমিই না হয় বিক্রী করিয়ে সোণা কিনে পাঠাব—”

চেলা বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, “না না—সে জন্মে কোন ভাবনা নেই—আমার কাছে দিন্ না—আমি বিক্রী করে দেব।” এই কথা বলিয়া চেলা চকিতে হার ছড়া রমণীর হস্ত হইতে তুলিয়া লইয়া গণককে দিয়া বলিল, “এই নিন্ রাখুন।” পরে রমণীর দিকে চাহিয়া কহিল, “আমি আজই ত্রিপুণ্ডক ঠাকুরকে ডাকিয়ে শিবপূজোর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—সে অমন কত বড় বড় গ্রহের দোষ কাটিয়ে দিয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় স্বচ্ছন্দে ঘরে যা’ন—আপনার মনের দুঃখু ঘুচে গেল বলে—কি বল গো দাদাঠাকুর?” এই কথা বলিয়া সে গণকঠাকুরকে সাক্ষ্য মানিল এবং গণক শিরঃসঞ্চালন করিয়া তাহার সমর্থন করিলেন।

চেলার সেই স্বর্ণের হার লইবার আগ্রহ দেখিয়া জ্যোৎস্না হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই—সে জনান্তিকে অজয়কে বলিতেছিল, “দেখেছ, মেয়েমানুষকে একলা পেয়ে, কিরকম করে

ঠকিয়ে হার ছড়া নিলে—বোধ হয় কোনও পুরুষমানুষ সঙ্গে থাক্‌লে পার্‌ত না।”

সেই সময়ে চেলা বলিয়া উঠিল, “সরে যাও সব—মা লক্ষ্মীকে পথ ছেড়ে দাও।” সে এরূপ ভাবে ঐ কথা বলিয়া রমণীকে লইয়া চলিল যে তাহার অতিভক্তির ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অজয় ও জ্যোৎস্না উভয়েই পুনরায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। সেই সময়ে হঠাৎ রমণীর দৃষ্টি অজয়ের দিকে পতিত হওয়ায় রমণী এরূপভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যে পরিচারিকা না ধরিলে বোধ হয় সে পড়িয়াই যাইত।

ক্ষণেকে আত্মস্থা হইয়া রমণী পুনরায় অজয়ের দিকে চাহিতেই জ্যোৎস্নার দিকেও তাহার দৃষ্টি পড়িল এবং উভয়ের মুখে হাস্য-রেখা দেখিয়া রমণীর বিষাদ-মলিন মুখকমলের কোমল ভাব নিমেষে কঠিন হইয়া গেল।

ভদ্রগৃহস্থের অন্তঃপুরিকা বলিয়া অজয় রমণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই—কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়াছিল। সে অপ্রস্তুত হইয়া অজয়ের গাত্রে হাত দিয়া বলিল, “দেখ, আমরা হাস্‌ছিলুম বলে উনি হয়ত মনে করেছেন ওঁকে দেখে হাস্‌ছিলুম। চল আমরা যাই।” এই কথা বলিয়া জ্যোৎস্না অজয়ের হস্ত আকর্ষণ করিতেই উভয়ে ত্বরিতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। রমণী তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, “পায়ে হোঁচট লাগ্‌ল বুঝি?”

সেই প্রশ্নে রমণী অপদেবতাক্রান্তার মত তাহাকে পাশ কাটাইয়া স্খলিত-চরণে বাটীর দ্বারে গিয়া দেখিল অজয় গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। জ্যোৎস্না তাহার সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, অজয় তাহাকে সস্নেহে টানিয়া আনিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া গাড়ীর দ্বার ঈষৎ বন্ধ করিয়া, কোচম্যানকে বলিল—"যাও"।

গাড়ী চলিয়া গেল।

রমণী একদৃষ্টে সেই দ্রুতগামী অশ্বযানের দিকে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিতে হইবে কি সেই রমণী অপর কেহ নহে অজয়েরই পত্নী—অরুণা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অজয় যে রাত্রে গৃহত্যাগ করে তাহার পরদিন মধ্যাহ্নকালে আহারাদির সময় অনুপস্থিত থাকাতে তাহার খোঁজ পড়িল। হেমাঙ্গিনী তাহার মাতার কাছে আসিয়া খবর দিল, "বৌদি' এখনো বিছানায় শুয়ে আছে।"

হৈমবতী কহিলেন, "তা থাকবে বৈ কি। বড় মানুষের মেয়ে, বেলা বারটা না বাজ্‌লে কি ঘুম ভাঙ্গে? লজ্জাও করে না —অজয়টাও অধঃপাতে গেছে—বাবুও এখনো ওঠেন্‌নি বুঝি?"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা ঘরে নেই। বৌদি' একলা শুয়ে আছে—উঠ্‌তে বল্‌লুম—তা বল্‌লে অসুখ করেছে।"

হৈমবতী কহিলেন, "যা' জিজ্ঞেস্ করে আয়, অজয় কোথায় গেছে—বামুনঠাকুর সন্ধ্যে অবধি তার জন্মে হাঁড়ী নিয়ে বসে থাকবে না কি?"

হেমাঙ্গিনী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "জিজ্ঞেস করলুম—বৌদি' কোনো কথা কইলে না—কাঁদছে।"

হৈমবতী কহিলেন, "কাঁদছে! তবে বুঝি অজয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে? তাই অসুখ করেছে বলে ঢংকরে পড়ে আছে?"

শেষে যখন অপরাহ্ন হইল—অজয় আহারাদি করিতে

আসিল না, তখন পুনরায় তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। হেমাঙ্গিনী অরুণার কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া, আর তাহার কাছে যায় নাই। শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া গিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করাতে অরুণার ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল—সে দরদরিত ধারায় অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার নিকট অজয়ের গৃহত্যাগ করিয়া কর্ম্মের চেষ্টায় পশ্চিমে যাইবার কথা প্রকাশ করিল।

সেই কথা লইয়া প্রথমেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত হৈমবতীর একপালা কোন্দল হইয়া গেল। হৈমবতী কহিলেন, "এ সব ঐ মুখবুজুনী বৌ বেটীর কারসাজি—অষ্টপ্রহর বিষমন্তর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে ঘর ছাড়া করে তবে বাঁচ্‌ল।"

বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, "ও ভাল মানুষের ঝিকে দোষ দিওনা বৌ—তুমিই বাছাকে ভিটে ছাড়া কর্‌লে। দিন রাত্তির তোমার বাপের টাকার খোঁটা দিয়ে দিয়ে বাছাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার যোগাড় করেছিলে। হাজার হো'ক বড়টি হয়েছে—বিদ্যে শিখেছে—অত গঞ্জনা সইতে পার্‌বে কেন? এখন থাক তুমি তোমার টাকা নিয়ে, বাছা আমার যে পথে গেছে, আমরাও সেই পথে যাই।" এই কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বসনাঞ্চলে নয়নজল মুছিতে মুছিতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন ডাকযোগে অজয়ের পত্র আসিল। সেই পত্র প্রাপ্ত হইবার পর হৈমবতী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—সেই দিন হইতে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন অজয়ের পর-পত্রে তাহার ঠিকানা জানিতে পারিলেই তিনি তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়া সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল—সেই 'পর-পত্র' আসিল না। তিনি আশায় আশায় আর একটা সুদীর্ঘ সপ্তাহ কাটাইবার পর অরুণার নামে একখানি পত্র আসিল—তাহাতেও অজয় ঠিকানা দেয় নাই। ক্রমে হৈমবতী নিতান্তই অধীর হইয়া উঠিলেন। পুত্রের গৃহত্যাগের মর্ম্মান্তিক দুঃখে তিনি পুত্রবধূকে গঞ্জনা দিতে অথবা ননন্দার সহিত কলহ করিতে ভুলিয়া যাইলেন। পুনরায় অজয়ের পত্রের প্রতীক্ষায় হৈমবতী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অরুণা তিনজনেই ব্যাকুলভাবে দীর্ঘ দিন গুলি গণিয়া গণিয়া কাটাইতে লাগিলেন - কিন্তু যখন তাহার পর মাসাধিক কাল অতীত হইয়া গেল তথাপি অজয়ের কোনও সংবাদ আসিল না। তখন তাঁহাদের মনের ব্যাকুলতা দুর্ভাবনায় ও ভীতিতে পরিণত হইল। হৈমবতী নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। অজয়ের চিঠিতে বারাণসীর ডাকঘরের ছাপ ছিল বলিয়া সেখানে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু অজয়ের কোন সংবাদই মিলিল না। হৈমবতী পুলিস-গেজেটে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত করিলেন—

"বাবা অজয়,

তুমি ঘরে ফিরিয়া আইস। আমি আর তোমাকে কখনও কিছু বলিব না—তীর্থে গিয়া থাকিব। তুমি তোমার বিষয় সম্পত্তি ও ঘর সংসার বুঝিয়া লহ। তোমা বিহনে তোমার সনং অনাথার মত বেড়াইতেছে, বধূমাতার সোণার বর্ণ কালী হইয়া গিয়াছে, তোমার পিসিমাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায়। আর আমাকে শাস্তি দিও না।

তোমার হতভাগিনী—মা"

সে বিজ্ঞাপনের কোনও উত্তর আসিল না। শেষে হৈমবতী পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তাহাও বিফল হইল।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই অজয় গৃহত্যাগ করে। গ্রীষ্ম কাটিয়া বর্ষা আসিল। অরুণা নিদাঘের তপ্তবায়ুতে উষ্ণশ্বাস মিশাইল,—প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নে একান্তে বসিয়া নয়নাসার ফেলিতে লাগিল। সে প্রথমে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে হয়ত অজয় তাহার বিদ্যার যোগ্য বা আশার অনুরূপ কোন কর্ম্ম পাইতেছে না বলিয়া লজ্জায় সে কথা জানাইতেছে না,—ভাল কাজ পাইলেই সংবাদ দিবে। কিন্তু যখন মাসের পর মাস অতীত হইয়া গেল, তখন তাহার মনে নানরূপ দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল—হয়ত অজয় পীড়িত হইয়া কোনও অপরিচিত স্থানে নিরাশ্রয় ভাবে পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহা হইলেও সে কি অপর কাহাকেও

দিয়া সংবাদ পাঠাইতে পারিত না? তবে কি তাহার কোনও গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছে? অরুণা শিহরিয়া উঠিল।

একদিন জনৈক প্রতিবেশিনী অরুণাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তাহার দুর্ভাবনা বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। তিনি গল্প করিয়া গেলেন, "আমার এক খুড়শ্বশুর একদিন খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গঙ্গাস্নান কর্‌তে গেলেন—তা সেই যাওয়াই যাওয়া! সবাই বল্‌লে মনের দুঃখে গঙ্গায় ডুবে মরেছেন। বার বছর কেটে গেল; খুড়-শাশুড়ী শ্রাদ্ধ করিয়ে হাতের নোয়া খুলে থান কাপড় ধর্‌লেন। ওমা কামিক্ষেয় গিয়ে দেখেন, খুড়শ্বশুর দিব্যি জটা দাড়ি রেখে সন্নিসী হয়ে পাহাড়ে বসে আছেন! হুবহু খুড়শ্বশুর! খুড়-শাশুড়ী ত পাদুটো জড়িয়ে ধরে বাড়ী ফেরাবার জন্যে কত কান্না-কাটি করলেন। কিন্তু শেকল কাটা টিয়ে কি আর দাঁড়ে বসে? —তিনি কিছুতেই এলেন না। তা আমাদের ত মনে হয়, বাবু বেঁচে আছেন—সন্নিসী টন্নিসী হয়ে গেছেন।" সেই কথা শুনিয়া অরুণা ভাবিতে লাগিল হয়ত বা অজয় মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হইয়াই গিয়াছে। আবার ভাবিত অজয় পুরুষ হইয়া নিজে যে জ্বালা সহিতে পারিল না—সে কি বলিয়া তাহাকে একেলা সেই জ্বালা অহরহঃ ভোগ করিতে রাখিয়া গেল? নাঃ—অজয় ত সেরূপ স্বার্থপর—অবিবেচক নহে।

একই মর্ম্মান্তিক দুঃখের সমভাগিনী হইয়া হৈমবতী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গিয়াছিল—তাঁহারা

আর পরস্পরে কোন্দল করিতেন না। হৈমবতী—অরুণাকেও আর কোনও অপ্রিয় কথা বলিতেন না—তাহাকে যত্ন আদরও করিতেন না। তিনি সংসারের উপর বীতরাগিনী হইয়া, নিজের মনঃকষ্টে নিজেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অরুণাকে সান্ত্বনা দিবেন কি—তিনি নিজেই অষ্টপ্রহর হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। সনতের তখনও নিজের ও মাতার দুর্ভাগ্যের পরিমাণ বুঝিবার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। সে মাতার কাছে আসিলে পিতার সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া মাতার যাতনাই বৃদ্ধি করিয়া দিত। অরুণাকে দিন দিন শীর্ণা, মলিনা —প্রোষিত-ভর্তৃকার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার পিতা প্রাণকৃষ্ণবাবু তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন। হৈমবতী সে প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করিলেন না—তিনি সংসারের কোন কথাতেই আর নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন না—কিন্তু অরুণা সে প্রস্তাবে রাজি হয় নাই। সে ভাবিয়া ছিল যদি অজয় কোনও দিন হঠাৎ বাটীতে ফিরিয়া আসে? অরুণা সে সময়ে বাড়ীতে থাকিবে না—ইহা কি কখনও হইতে পারে? অরুণা পিত্রালয়ে যাইল না—কিন্তু তাহার পিতা ও মাতা উভয়েই মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেন। এখন আর হৈমবতীর ভয় নাই; তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনাও করেন না—অনাদরও করেন না—তাঁহারা আসিয়াছেন

কি, না আসিয়াছেন অধিকাংশ দিন তিনি সে সংবাদও রাখিতেন না।

ক্রমে শরৎ আসিল—মহামায়ার আগমনে বঙ্গজননীর গৃহে গৃহে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে অরুণার মনের বেদনাই বাড়িল। সে মণিবন্ধে শাঁখা, লোহা ও দুইগাছি স্বর্ণ বলয় ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কারই খুলিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ রাশি তৈল ও সংস্কার অভাবে রুক্ষ জটাভারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মহাষষ্ঠীর দিন সনতের কল্যাণে নববস্ত্র পরিধান করিতে গিয়া সে চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না—গৃহতলে লুটাইয়া পড়িয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পূজার পরে অরুণা বলিল সে কাশী যাইবে। বারাণসী হইতে অজয় চিঠি লিখিয়াছিল—সে একবার নিজে গিয়া সেই স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নিকট অজয়ের অনুসন্ধান করাইবে। সে শুনিয়াছিল সন্ন্যাসীরা কোনও না কোনও সময় একবার কাশীধামে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন—সে একবার স্বচক্ষে সেখানে থাকিয়া সন্ন্যাসীদের দর্শন করিয়া আসিবে—অজয় যে সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে পারে সেই সন্দেহ, অরুণা তাহার মন হইতে একেবারে বিদায় দিতে পারে নাই। হৈমবতী সে প্রস্তাবে বাধা দিলেন না। তাঁহার নিজেরও মনে এক একবার তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া অজয়ের অনুসন্ধান

করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু সকলে একসঙ্গে যাইলে সনতের পাঠের ব্যাঘাত হইবে—সনৎ তাঁহার কাছেই শিশুকাল হইতে শয়ন করে এবং তাঁহারই কাছে থাকে বলিয়া তিনি তৎকালে নিজে যাইতে পারিলেন না—বিষ্ণুপ্রিয়াকে অরুণার সঙ্গে পাঠাইলেন। বাটীর প্রাচীন সরকার রামহরি, পাচিকা ও দাসদাসী সঙ্গে যাইল এবং অরুণার পিতা তাহাকে রাখিয়া আসিলেন।

কাশীতে অবস্থান কালে অরুণা প্রত্যহ নূতন নূতন ঘাটে স্নান করিতে যাইত এবং স্নানার্থিনী রমণীদিগের সহিত পরিচয় করিত। সে তাঁহাদের নিকট অজয়ের আকৃতি বর্ণনা করিয়া, তাহার মত কোনও লোককে তাঁহারা দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিত। অরুণার ব্যাকুলতা দেখিয়া অনেকেই তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, কিন্তু কেহই কোনও সন্ধান দিতে পারিত না। অরুণা প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিতে ও তাহার মন্দির-দ্বারে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামীর পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতে যাইত। সেই সময়ে ও গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার পথে, অরুণা যেখানে সাধু সন্ন্যাসীগণের সমাগম দেখিত সেইখানেই উৎসুক-নয়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাহাদের দর্শন করিত—যদি তাহাদেব মধ্যে অজয়কে কোনও দিন দেখিতে পায়।

একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে জনৈক নারী তাহাকে বলিলেন, কাশীতে একজন দৈবজ্ঞ আসিয়াছেন তিনি পিশাচসিদ্ধ,

তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন—হয়ত তাহাকে আনাইয়াও দিতে পাবেন। সেই দৈবজ্ঞের একজন শিষ্য তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া থাকে—যদি অরুণা সম্মত হয় তাহা হইলে সেই শিষ্যকে তিনি অরুণাদেব বাসায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। অরুণা তখন নৈরাশ্যের সাগবে ডুবিতেছিল—একগাছি তৃণের আশ্রয়ও তখন তাহার কাছে অবহেলার বস্তু নহে। সে আগ্রহের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেই পরদিবস দৈবজ্ঞের চেলা আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। চেলা অরুণাকে স্তোভ বাক্যে ভুলাইয়া ইঙ্গিত করিয়া আসিল, দৈবজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করেন না—কিন্তু গ্রহশান্তি করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। অরুণার নিকট অর্থ ছিল না—শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে জানাইলে তিনি দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিবেন কি না সন্দেহ করিয়া অরুণা তাঁহাকে তাব করিয়া টাকা পাঠাইতে বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিল। যদি কখনও হঠাৎ অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় এই ভাবিয়া সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আপনার কয়েকখানি মূল্যবান অলঙ্কার সঙ্গে আনিয়াছিল। এক্ষণে দৈবজ্ঞের শিষ্যের কথা শুনিয়া অরুণা তাহার একছড়া হার সঙ্গে লইয়া দৈবজ্ঞের বাটীতে গিয়াছিল। সেইখানেই তাহার সহিত অজয় ও জ্যোৎস্নার সাক্ষাৎ হয়।

অজয়কে দেখিয়া অরুণা প্রথমে চমকিত হইয়া মনে করিয়াছিল—সে কি কোন ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া দেখিতেছে, না

দৈবজ্ঞই তাঁহার অমানুষিক শক্তি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন—তাহার স্বামীকে, সন্ন্যাসী বেশে নহে, তাহার অভ্যস্থ পরিচ্ছদে স্বশরীরে আনিয়া তাহার নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অজয়ের মুখে হাস্যরেখা এবং পার্শ্বে জ্যোৎস্নাকে তাহার সাথী দেখিয়া অরুণার মস্তিষ্কের ভিতর পলকে ওলট পালট হইয়া গেল—সে ভাবিল তবে কি অজয় পরনারীর লোভে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে এবং সঙ্গিনীকে তাহার দুর্দ্দশা দেখাইয়া উভয়েই রঙ্গ-রহস্য করিয়া হাস্য করিতেছে? তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই যখন জ্যোৎস্না অজয়কে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল—অরুণা ঠিক বুঝিতে পারিল না যে অজয় তাহাকে চিনিয়াও চিনিল না বা তাহাকে দেখিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল। উন্মত্তার মত দ্বারে ছুটিয়া আসিয়া সে যখন দেখিল অজয় প্রকাশ্য স্থানে আসিয়াও—তাহার সঙ্গিনীকে কিরূপ সোহাগে গাড়ীতে নিজের পার্শ্বে বসাইল, তখন একটা দারুণ অভিমান আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। অজয় যে পরস্ত্রী ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই এবং তাহাকে চিনিতে পারে নাই একথা তখন অরুণার মনে স্থানই পাইল না। অরুণা এতদিন তাহার মনের মন্দিরে যে দেবমূর্ত্তিকে চির-সুন্দর ভাবিয়া নিশিদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, সেই মূর্ত্তিকে ভূলুণ্ঠিত—কর্দ্দমাক্ত ভাবিয়া তাহার মনের পবিত্র, কোমল ও উচ্চভাবগুলিকে যেন কোনও নিষ্ঠুর দৈত্য

আসিয়া এক নিমেষে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল। পরিচারিকা নূতন লোক—সে অজয়কে চিনিত না। সে গণকের দ্বারে অরুণাকে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে বাটী যাইবার জন্য সঙ্গে আসিতে বলিল। তাহার বাক্য-ধ্বনিতে অরুণার চমক ভাঙ্গিল। সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় স্খলিত-পদে পরিচারিকার অনুগমন করিয়া অদূরেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

বাসায় আসিয়া অরুণা কাহারও সহিত কথা কহিল না—নিজের কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহতলে পড়িয়া রহিল। আহারের সময় ডাকিতে আসিলে বলিল, তাহার অসুখ করিয়াছে, সে আহার করিবে না। সে ভূমিশয়নে নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে সেই এক কথাই ভাবিতে লাগিল—তাহার স্নেহময় স্বামিদেবতার শেষে এই দশা হইল? তাহাকে কি তবে সত্য সত্যই মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া পরনারীর লোভে সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল? না—তাহা হইতে পারে না। অতটা প্রবঞ্চনা কি কখনও সম্ভব—তাহা হইলে কি সে ঘৃণাক্ষরেও তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিত না। তবে কি বিদেশে আসিয়া অজয়ের চরিত্র স্খলন হইয়াছে? কিন্তু সেরূপ অধোগতি কি হঠাৎ হওয়া সম্ভব? তবে সে প্রথম হইতেই চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছিল কেন? অজয় কি জানিত না যে তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দীর্ঘ দিবসগুলি অরুণা কি করিয়া কাটাইতেছিল—

তাহাকে সংশয়ে রাখা যে কত নিষ্ঠুরতা তাহা কি অজয় হৃদয়ঙ্গম করে নাই? তবে সে এতদিন কেমন করিয়া তাহাকে এই মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়াছে? সে যে প্রাণে বাঁচিয়া আছে, সুস্থ আছে—এ সংবাদটাও ত তাহার দেওয়া উচিত ছিল? অতি বড় নিষ্ঠুরেরও এ জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু অজয় ত নিষ্ঠুর নয়—সে যে হৃদয়বান—কোমলপ্রাণ; তাহাকে ভুলাইয়া হঠাৎ এরূপ অমানুষ করিতে পারে এমন কুহকিনী কি জগতে কেহ আছে? কিন্তু তাহা না হইলে সে আজ তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন আমোদ পাইয়াছে এরূপ ভাবে হাসিতেছিল কেন? অজয় যে পরনারী-রত হইয়া তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছে এই ধারণা অরুণার হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, অজয়ের উপর দারুণ অভিমান তাহাকে যেন বিকারগ্রস্ত করিয়া রাখিল। ক্রমশঃ সেই অভিমান তাহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া মর্ম্মন্তুদ দুঃখে পরিণত হইল—সে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল—জীবনে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। সে আপনার মনোভাব আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে পরিচারিকা আসিয়া দেখিল অরুণা গৃহতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। পরিচারিকা তাহার দুঃখের সেই নবীন উচ্ছ্বাসের কারণ কি

তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, এবং অরুণার নিকটেও কোন সদুত্তর না পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে গিয়া সংবাদ দিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রথমে কোনও উত্তর পাইলেন না। পরে অনেক সাধ্য-সাধনা ও সান্ত্বনার পর অরুণা, কাঁদিতে কাঁদিতে, দৈবজ্ঞের কাছে গমন হইতে অজয়ের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা, অসংলগ্নভাবে—রুদ্ধ-শ্বাসে বলিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "আর তাঁকে খুজ্‌তে হবে না পিসিমা—এখন শীগ্‌গির যা'তে আমার মরণ হয় সেই আশীর্ব্বাদ কর—আর যেন আমাকে এই পোড়া মুখ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে না হয়।"

বিষ্ণুপ্রিয়া অরুণার কথা শুনিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ থাকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমাব ভুল হয়েছে বৌ—যা'কে দেখেছ সে কখ্‌খন আমাদের অজয় নয়—তুমি আর কা'কে দেখেছ।"

অরুণা কহিল, "না পিসিমা—ভুল হয়নি, দিনের বেলা, অত কাছ থেকে দেখলুম, ভুল হ'বে কি ক'রে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া সে কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না, তিনি কহিলেন, "তা হ'লে অজয় তোমাকে দেখ্‌তে পায়নি। তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে হাসি-তামাসা কর্‌বে, কি চিন্‌তে পারেনি ভাণ করে চলে যা'বে—এমন কথা আমার অজয়ের নামে অতিবড়

শত্তুরেও বল্‌তে পার্‌বে না। আর সে যে এত বেহায়া হ'বে তা আমি নিজের চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করি না।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সরকার রামহরিকে ডাকাইয়া অজয়ের, বা অরুণা যাহাকে দেখিয়া অজয় বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছিল তাহার, অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। অরুণার সঙ্গে যে পরিচারিকা দৈবজ্ঞের বাটীতে গিয়াছিল, সে বলিল, সে অজয়কে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, কিন্তু অরুণা যাহাকে দেখিয়া অজয় বলিতেছে তাহাকে সে নিকট-দৃষ্টিতে দৈবজ্ঞের বাটীতে দেখিয়াছিল এবং পুনরায় দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

সরকার তাহাকে সঙ্গে লইয়া, কোথাও বা পদব্রজে কোথাও বা গাড়ীতে, সমস্ত কাশী তিন দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল, কিন্তু অজয়ের কোনও সন্ধান মিলিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অরুণার পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া রামহরি তিন দিন সমস্ত কাশী প্রদক্ষিণ করিয়াও যে অজয়ের সাক্ষাৎ পায় নাই, তাহার কারণ, যে দিন অরুণা অজয়কে গণকের বাটীতে দেখিতে পায়, সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে অজয়, ধরণীবাবু ও জ্যোৎস্নার সহিত, বারাণসী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গমন করে।

ধরণীবাবুর কলিকাতা-এজেন্সীর তত্ত্বাবধারক, তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই, কলুটোলায় একখানি বাসাবাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ধরণীবাবু, কন্যা ও জামাতাকে লইয়া, সেই বাসায় আসিয়া উঠিলেন এবং কুক কোম্পানীর সহিত ভাড়া হিসাবে গাড়ী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার এজেন্সী-আপিস বাসা হইতে অনতিদূরে—হ্যারিসন রোডে--ছিল বলিয়া অজয় এক একদিন পদব্রজেই আপিসে যাইত, এবং ধরণীবাবুর বাসায় ফিরিবার পূর্ব্বেই বাসায় আসিত। বারাণসী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে যেমন অজয় আপিস ব্যতীত অন্য যেখানে যাইত জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, কলিকাতায় সেরূপ সুবিধা হইত না। সেই জন্য অজয় সন্ধ্যার পর এক একদিন জ্যোৎস্নার সহিত গড়ের

মাঠের দিকে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইত, নতুবা আর কোথাও যাইত না। বিবাহের পর হইতে অজয়ের আত্মীয় স্বজনগণের অনুসন্ধানের কথা জ্যোৎস্না উত্থাপন করিত না এবং তাহার সেই মৌন-ভাবের মধ্যে একটা অপ্রীতি ও আশঙ্কার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া, অজয়ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে কথার উত্থাপন করে নাই। কলিকাতায় আসিয়া অতীত-জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অজয়ের প্রবৃত্তিও ছিল না।

বারাণসীর পথঘাট যেমন অজয়ের অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় নাই, তেমনি কলিকাতাও তাহার পরিচিত বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কবে কি সূত্রে সে পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিল তাহা অজয়ের স্মরণে আসিত না। আপিসে যাইবার ও আসিবার সময় অজয় কোনও কোনও দিন বিভিন্ন পথে যাতায়াত করিত, নতুবা সে অন্য কোথাও যাইত না। সপ্তাহকাল অজয়ের সহিত কোনও পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ হয় নাই অথবা সাক্ষাৎ হইলেও সে চিনিতে পারে নাই।

কলিকাতায় আসিবার অষ্টম দিবসে, অপরাহ্ন ৪টার সময়, অজয় আপিস হইতে হ্যারিসন্ রোড ও কলেজষ্ট্রীট ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। সেই সময়ে হেয়ারস্কুল, হিন্দুস্কুল প্রভৃতি স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের ছুটী হওয়াতে কলেজষ্ট্রীটের ফুটপথে বালকগণের এবং রাস্তায় গাড়ীর ভিড় হইয়াছিল। সেদিন

সন্ধ্যার সময় জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে লইয়া অজয়ের গঙ্গার ধারে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়া ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড্ শুনাইয়া আনিবার কথা ছিল। সেই কথা স্মরণ হওয়াতে অজয় শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিবাব উদ্দেশ্যে অ্যালবার্ট হলের মোড় হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখের ফুটপথে আসিতেছিল। সে যেমন কলেজষ্ট্রীট পার হইতে যাইবে, অমনি হিন্দুস্কুলের দিক্ হইতে একখানি গাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া উত্তর দিকে মোড় ফিরিতেই, গাড়ীর ভিতর হইতে একজন বালক তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কোচ্ম্যানকে বলিল, "থামাও"। বালকের উচ্চকণ্ঠধ্বনিতে চমকিয়া উঠিয়া অজয় যেমন সেই-দিকে ফিরিয়াছে, অমনি দক্ষিণদিক হইতে আর একখানি গাড়ী নক্ষত্রবেগে তাহার উপরে আসিয়া পড়িল—ঘোড়ার গাত্রের ধাক্কা খাইয়া অজয় ঠিক্‌রাইয়া প্রথমোক্ত গাড়ীর দিকে গিয়া না পড়িলে অজয়ের দেহের উপর দিয়া দ্বিতীয় গাড়ী চলিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম গাড়ীর কোচ্ম্যান প্রাণপণ-শক্তিতে অশ্বরশ্মি টানিয়া গাড়ীর গতিরোধ করিয়াছিল। সেই গাড়ীর কবাটের ধারে মাথা ঠুকিয়া অজয়ের দেহের ঊর্দ্ধভাগ গাড়ীর মুক্ত দ্বারপথে গাড়ীর মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িতেই গাড়ীর ভিতর হইতে পূর্ব্বোক্ত বালক তাহাকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা!" একহস্তে গাড়ীর কবাট অপর হস্তে বালকের প্রসারিত বাহু ধরিয়া ফেলিয়া অজয়,

পতনের বেগ সংবরণ করিয়া বালকের মুখের দিকে চাহিয়া, বলিয়া উঠিল—"সনৎ!"

বালক অজয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় বলিল, "বাবা!" পলকের মধ্যে সেখানে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়া গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নিকটস্থ ব্যক্তি অজয়কে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব বেঁচে গেছেন—লাগে নি ত?"

অজয় মস্তকের আঘাতস্থানে হাত দিয়া বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "না"।

অজয়ের মস্তিষ্কে তৎকালে অতীত কথা তরঙ্গায়িত হইয়া আসিয়া বর্ত্তমানকে ভাসাইয়া দিয়া, যুগপৎ সহস্র স্মৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকাময় উত্তেজনার সন্ধিক্ষণে, প্রাণপ্রিয় সনতের আতঙ্ক-মিশ্রিত উল্লাসধ্বনি, অজয়ের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীকে আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া, নিমেষের মধ্যে তাহার বহুদিন সুপ্ত অতীত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। যেন কোনও দৈবশক্তিমান যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে, লক্ষ্ণৌএর রেল সংঘর্ষের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত হইতে তাহার গৃহত্যাগের ঘটনাবলী, উজান বাহিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে, বায়স্কোপের চিত্রাবলীর মত, তাহার মানসপটের উপর দিয়া ভাসিয়া গিয়া তাহাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল।

তাহাকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া সনৎ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা—গাড়ীতে ওঠ।"

অজয় মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সনৎ কোচম্যানকে আদেশ দিল, "বাড়ী নিয়ে চল।" জনতা সরিয়া গেল। গাড়ী পিতা ও পুত্রকে বহন করিয়া গৃহের দিকে ছুটিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে লাগিতেই সনৎ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, "বাবা এসেছে!"—"বাবা এসেছে!!" শব্দে বহির্বাটী মুখরিত করিয়া অজয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা করিল। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সেই কথা অন্দরে, কাছারী-বাটীতে, সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে বাটীর দাসদাসী আত্মীয় পরিজন যে যেখানে ছিল সকলেই আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে বহির্বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসরাধিক কাল অজ্ঞাতবাসের পর অজয়, পুত্রের হাত ধরিয়া, তাহার মাতামহের সেই চিরপরিচিত পুরাতন আবাস-ভবনে পুনঃ-প্রবেশ করিল। অজয় দেখিল সে বাটীর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই—সেই পারাবতের দল উঠানের চারিপার্শ্বের কার্ণিসে বসিয়া কূজন করিতেছে—সেই দাস দাসী আত্মীয়বর্গ সকলেই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনের ছিন্ন-সূত্র কি পূর্ব্ব সূত্রের সহিত মিলাইয়া গাঁথিয়া দিবার মত আছে? অজয় চিন্তাকুল-হৃদয়ে ধীরপদবিক্ষেপে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতলে উঠিয়া তাহার পাঠাগারের সম্মুখের বারান্দায় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল। সনৎ ছুটিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া তাহার

পিতামহীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সনতের নিকট ও সহিস কোচম্যানের মুখে, কি অবস্থায় অজয়ের সহিত সনতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে কথা শুনিয়া সকলেরই মুখে, অজয় কোথায়—কি অবস্থায় ছিল, কেনই বা এতদিন বাটীতে আসে নাই এবং পত্রাদিও প্রেরণ করে নাই, সেই সংবাদ জানিবার জন্য অদম্য কৌতূহল প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু অজয়ের বিমর্ষবদনে চিন্তা ও অন্তর্দাহের লক্ষণ দেখিয়া কেহ তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। হৈমবতীকে আসিতে দেখিয়া সকলে অজয়ের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

অজয় দূর হইতে তাহার মাতাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—তাঁহার মুখাবয়বে সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপের—পূর্ব্ব-ঔদ্ধত্যের কোনও লক্ষণ নাই—দেড়বৎসরে তিনি যেন দশ বৎসরের গতি ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে গভীর বিষাদের রেখা পড়িয়াছে—মস্তকের কেশে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

হৈমবতী বারান্দায় প্রবেশ করিতেই অজয় উঠিয়া গিয়া তাঁহার পদদ্বয়স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। হৈমবতী তাঁহার জপের মালা সমেত দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অজয়ের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন—আশীর্ব্বাদ বাক্য তাঁহার মুখেই মিলাইয়া গেল। অজয়, নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে, মাতার পাদমূলেই বসিয়া পড়িল। হৈমবতীও সেই খানে বসিয়া কিয়ৎ-

ক্ষণ অজয়ের মুখের দিকে করুণদৃষ্টিতে বাষ্পাকুলনয়নে চাহিয়া ভগ্নস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"একটা খবরও কি দিতে নেই —যে বেঁচে আছিস্?" এই কথা কয়টী কহিতেই তাঁহার কণ্ঠ-রোধ হইবার উপক্রম হইল—তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অজয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "পশ্চিমে রেলের গাড়ীথেকে পড়ে গিয়ে আমাব মাথায় লেগেছিল—আমি বাড়ী ঘর, তোমাদের কথা, সব ভুলে গিয়েছিলুম?"

হৈমবতী বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাহার বিশ্বাস হইল না। তাঁহার ভয় হইল অজয় কি প্রকৃতিস্থ আছে—না প্রলাপ বকিতেছে।

হৈমবতীর সন্দিগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া অজয় পুনরায় কহিল, "রেল গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কালেগে—গাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছিল—অনেক লোক মারা গিয়েছিল—আমি মরিনি কিন্তু আমার জ্ঞান ছিলনা—বাঁচবারও আশা ছিল না। হাঁসপাতালেই হয়ত মারা যেতুম। একজন ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান—অনেক খরচ পত্র করেন—বোধ হয় আমরা নিজেরাও তাঁর চেয়ে যত্ন করে চিকিৎসা করাতে পারতুম না। প্রাণে বেঁচে গেলুম—কিন্তু আগেকার কোনও কথা আমার মনে এলনা—সব ভুলে গিয়েছিলুম। আজ সনৎকে দেখে—সব মনে পড়ে গেল!

হৈমবতী সেই আশ্চর্য্য-কাহিনী বিশ্বাস করিবেন কি না,

তাহা তখনও স্থির করিতে পরিতেছিলেন না, কিন্তু অজয় যে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে সে জন্য তিনি ইষ্টদেবতার চরণে মনে মনে শতসহস্র প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ব্বাক্যেই যে অজয় তাহার ধনজন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ঐশ্বর্য্যসুখ সমস্ত ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে দুঃখ তাঁহার মর্ম্মান্তিক লাগিয়াছিল, সেই লজ্জায় তিনি মরমে মরিয়া যাইতে ছিলেন। লোকের কাছে নিজের অপবাদ স্বীকার করিবার—নিজের অন্তরের দৈন্য পরকে জানাইবার—পাত্রী তিনি ছিলেন না, কিন্তু আপনার অন্তরের অন্তরে তিনি অনুভব করিতেছিলেন—দর্পহারী তাঁহার দর্প একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

হৈমবতী বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "তা—যা হ'বার তা হয়ে গেছে। ঠাকুর যে মুখ তুলে চেয়েছেন—ঘরের বাছাকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেই ভাল। আমি ত ভেবে ভেবে এক একবার মনে করতুম বুঝি পাগল হয়ে যা'ব। ঠাকুরঝিকে সঙ্গে করে বৌমা ত তোমাকে খুঁজতে কাশীতে গিয়ে বসে আছেন। আমি যে ঘর দোর ছেড়ে কোথাও যা'ব তাও পারলুম না। নাও বাবা এখন তোমার ঘর সংসার তুমি বুঝে নাও। বৌমাকে আনতে লোক পাঠাই। আমি এইবার বৃন্দাবনে গিয়ে থাকব—আর সংসার সংসার করে জ্বলে মরব না। সনৎটাকে ছেড়ে থাকতে পারি না—তা ও-ই গিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে দেখে আসবে—কি বলিস্‌রে ?"

সনৎ সেই সময়ে সেখানে আসিয়াছিল—তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াই হৈমবতী শেষ কথাগুলি বলিলেন। সনৎ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "না ঠাকু'মা—তুমি কোথাও যেতে পাবে না।"

হৈমবতী বসনাঞ্চল দিয়া আর্দ্রচক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া অজয়কে কহিলেন, "এখন চল—কাপড় চোপড় ছাড়্‌বে চল।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরিচারক আসিয়া কখন বারান্দার গ্যাস জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে তাহা অজয় লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে তাহার চমক ভাঙ্গিল—মনে পড়িল জ্যোৎস্না তাহার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে এবং তাহার বাসায় ফিরিতে এত বিলম্ব হওয়াতে ধরণীবাবুও হয়ত দুর্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন।

অজয় বলিল, "না মা, আজ আর থাক্‌তে পার্‌ছি না—কাল সকালেই আবার আস্‌ব।"

হৈমবতী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? আবার যাবি, কোথা? যেখানে ছিলি, সেখানে লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি—ঠিকানা বলে দেনা?"

অজয় বলিল, "না মা লোক পাঠালে হ'বে না—আমাকে নিজেই যেতে হ'বে। তাঁরাই যে আমার প্রাণরক্ষা করেছেন—আমার যে এখানে কোন আপনার লোক আছে—তোমরা আছ, বাড়ী ঘর আছে—তা ত তাঁরা জানেন না?"

হৈমবতী উত্তর দিলেন, "তা আগে নাই বা জানলেন—এখন ত শুনবেন? তা হলেই হলো।"

অজয় কহিল, "না মা, তাঁরা ত একরকম পথে কুড়োনো মরা মানুষকেই বাঁচিয়ে তুলে, কেউ নেই জেনে আপনার ক'রে নিয়েছেন—"

হৈমবতী বাধা দিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "কি ক'রে নিয়েছেন?"

অজয় উত্তর দিল, "আপনার ক'রে নিয়েছেন। আমিও যে আবার জড়িয়ে পড়েছি মা—তোমরা সবাই যে আছ তা ত আর আমার কিছুই মনে ছিল না—আমি যে আবার—"

হৈমবতী চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আবার—কি করেছিস্?"

অজয় অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, "বিয়ে করেছি।"

হৈমবতী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কায়েতের মেয়ে?"

অজয় আনতবদনে উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা, কায়স্থ—কুলীন।"

হৈমবতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্থিরভাবে কহিলেন, "বেশ, তাঁকে আন্‌তে পাঠাই—তিনি আমার ঘরে থাক্‌বেন—আমি না হয় ঠাকুরঝির পাশের খালি ঘরটায় শোব। আমার পাঁচটা নয় দশটা নয় একটা ছেলে—ছুটো বৌকে কি আর

ভাত কাপড় দিতে পার্‌ব না? তার জন্যে আবার কিন্তু মিন্তু হচ্ছিস্ কেন?"

অজয় অবনত বদনেই কহিল, "ভাত কাপড়ের জন্যে ভাবনা নয় মা। দাদামশায় তোমার জন্যে যা রেখে গেছেন—তার চেয়ে ঢের বেশী টাকা তার বাপের আছে—সবই তার—আর ভাই বোন কেউ নেই।"

হৈমবতী ক্ষুণ্নস্বরে কহিলেন, "তা হলেই বা—তা বলে কি স্বামীর ঘর করবেন না নাকি?"

অজয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিল, "না—তা নয়, তবে কি না তোমরা সবাই আছ জান্‌লে ত আর বিয়ে হ'ত না—আমার সে কথা মনে থাকলে আমিই বা রাজি হ'ব কেন? এখন সবই ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে কি না? কথাটা আমাকে নিজে গিয়েই তাঁদের শোনাতে হবে। কি অবস্থায় যে আমি পড়ে ছিলুম—আর তাঁরা আমাকে কি ভাবে রেখে-ছিলেন, সব শুনলে তুমিই বুঝতে পার্‌বে তাঁদের আজ আমি কি রকম গোলযোগে ফেলে দিলুম—আর আমি নিজেও কি বিভ্রাটে পড়লুম।" এই কথা বলিয়া অজয় ধরণীবাবুর ও জ্যোৎস্নার সহিত তাহার রেলগাড়ীতে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যোৎস্নার সহিত বিবাহ ও বারাণসী হইয়া কলিকাতায় আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

অজয়ের কথা শেষ হইলে হৈমবতী চিন্তিতভাবে কহিলেন,

"তা হ'লে রামহরি যে চিঠি লিখেছে—বৌমা নাকি তোব মত কাকে কাশীতে দেখেছেন—সে কথা কি সত্যি নাকি? তুই কি দিন দশেক হল কাশীতে একজন গণকারের বাড়ী গিয়েছিলি?"

অজয় চমকিত হইয়া কহিল, "হাঁ মা—গিয়েছিলুম!"

হৈমবতী কহিলেন, "সঙ্গে বুঝি ছোট বৌমা ছিলেন?

অজয় আনতবদনে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

হৈমবতী প্রশ্ন করিলেন, "সেখানে কি বৌমাকে দেখিস্ নি?"

কাশীতে গণকের বাড়ীতে যে শোকাতুরা ভদ্রমহিলা গণককে স্বর্ণের হার দিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার কথা অজয়ের স্মরণ হইল এবং সে বুঝিতে পারিল সেই স্ত্রীলোকই অরুণা। অজয় বিচলিতভাবে ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "একজন স্ত্রীলোককে দেখে ছিলুম বটে। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে দেখিনি, আর চিন্‌তেও পারিনি।"

হৈমবতী কহিলেন, "বৌমা মনে করেছেন—তুই তাঁকে চিনেও চিনিস্ নি। ঠাকুরঝি বুঝিয়েছেন—তা হতেই পারে না—সে আর কেউ হবে—নয়ত তুই তাঁকে দেখ্‌তে পাস্‌নি।"

অজয় উদ্বিগ্নভাবে কহিল, "আমি ভাল করে দেখিওনি বটে—আর চিনতেও পারিনি।"

হৈমবতী কহিলেন, "সে যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, এখন

বলিস্ ত ছোটবৌমাকে আন্‌তে পাঠাই—তাঁর বাপ কি পাঠাবেন না ?”

অজয় চিন্তিত ভাবে উত্তর দিল, “তাঁরা পশ্চিমে থাকেন — এখানকার ধরণ ধারণ ঠিক জানেন না ত—আমাকে আজ নিজে গিয়ে কথাটা আগে তাঁদের শোনান দরকার। তার পব যা হয় কাল সকালে এসে বল্‌ব।”

মাতার মুখ অপ্রসন্ন ও শঙ্কাপূর্ণ দেখিয়া অজয় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, “ভয় নেই—আর তোমাদের ছেড়ে কোথাও পালাব না—কাল সকালেই আস্‌ব। না হয় সঙ্গে লোক দাও না—বাড়ীটা দেখে আসুক ?”

অগত্যা হৈমবতী বাড়ীর গাড়ী ও বাটীর সরকারকে এবং পরিচারক পতিতপাবনকে সঙ্গে দিলেন। অজয় মাতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া সে রাত্রির মত ধরণীবাবুর কলুটোলার বাসায় যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এদিকে জ্যোৎস্না অপরাহ্ন ৫টার পর হইতেই অজয়ের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। ছয়টার সময় ধরণীবাবু বাসায় ফিরিলেন—সেই গাড়ীতেই অজয় ও জ্যোৎস্নার ইডেনগার্ডেনে ব্যাণ্ড্ শুনিতে যাইবার কথা ছিল। অজয় বাসায় ফিরে নাই শুনিয়া ধরণীবাবু বিস্মিত হইলেন। ৭টা বাজিলেও যখন অজয় ফিরিল না তখন জ্যোৎস্না গাড়ী বিদায় করিয়া দিল—বলিল, অজয় আসিলেও সে দিন আর সে যাইবে না—আর একদিন যাইবে। অজয়ের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া জ্যোৎস্না প্রথমে অধীর, পরে কিছু বিরক্ত, হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ও শেষে সেই উৎকণ্ঠা শঙ্কায় পরিণত হইল। ধরণীবাবুও সুস্থির হইয়া বসিতে পারিতে ছিলেন না—তিনি গৃহের মধ্যে পাদচারণা করিতে ছিলেন ও এক একবার জানালা হইতে পথের দিকে দেখিতে-ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার মনের উদ্বেগ দমন করিয়া জ্যোৎস্নাকে বলিয়া যাইলেন, "হয়ত কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাই কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

জ্যোৎস্না সে কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিল। যে অনিশ্চিত আশঙ্কা এতদিন

জ্যোৎস্নার অন্তরের নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত ছিল, ধরণীবাবুর সেই কয়টী সামান্য কথায় তাহা স্পষ্টতর মূর্ত্তিতে জ্যোৎস্নার মনশ্চক্ষে প্রকাশিত হইয়া জ্যোৎস্নাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিল। অজয়ের অজ্ঞাত জীবন-নাট্যের যবনিকা উত্তোলিত হইলে কি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সেই চিন্তা শতমূর্ত্তি ধরিয়া জ্যোৎস্নাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। মনের সেই অসহনীয় উৎকণ্ঠা হইতে অন্যমনস্ক হইবার আশায় জ্যোৎস্না ল্যাম্পের সম্মুখে গিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া বসিল—কিন্তু পুস্তকের একটী পংক্তিও সে পড়িতে পারিল না। শেষে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তাড়নায় অধীর হইয়া সে পিতার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "আপনি না হয় খেতে বসুন—তিনি এলে আলাদা খাবেন অখন।"

ধরণীবাবু কন্যার আননে আসন্ন ঝঞ্ঝাবৃষ্টির অগ্রদূত ঘনকৃষ্ণ জলদজালের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "না মা, চার পাঁচ জনকে একটু এগিয়ে রাস্তাগুলো একবার এদিক ওদিক দেখে আস্‌তে বলেছি—তারা ফিরে আসুক। কল্‌কাতার রাস্তা—গাড়ী ঘোড়ার ভয় আছে—আর একটু দেখে থানাতেও খবর নিতে হবে। আর একটু হো'ক।"

জ্যোৎস্না পিতায় কথায় কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না। সে নিজের ঘরে আসিয়া কি উপায়ে দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতেছে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া তাহাদের বাটীর দ্বারে লাগিল। ধরণীবাবু ত্বরিত-পদে

নামিয়া যাইলেন—অজয়ের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না নামিয়া গেল না—যাইতে তাহার পা সরিল না—সে একখানি পুস্তক খুলিয়া আলোর কাছে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট কথোপকথনের পর অজয় ও ধরণীবাবু উপরে আসিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। ধরণীবাবু নিজের কক্ষের দিকে গমন করিলেন—জ্যোৎস্না তাহার গৃহদ্বারে অজয়ের সুপরিচিত পদশব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু সে মুখ তুলিয়া অজয়ের দিকে চাহিল না—চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অজয় আসিয়া তাহার নিকটেই একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া অজয় নিজেই কহিল, "আস্‌তে দেরী হয়েছে বলে—বড় ভাব্‌ছিলে না কি? আজ আবার গাড়ী চাপা যেতে যেতে বেঁচে গেছি।"

সেই কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না যেন অন্ধকারে আলোকছটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই দেরী হল? কোথাও লাগে নি ত?"

অজয় ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "না লাগেনি—মাথায় সামান্য লেগে ছিল—ঠিক সে জন্যে দেরী হয়নি—বাড়ীতে গিয়ে ছিলুম্।"

জ্যোৎস্না চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কোথা গিয়েছিলে—বাড়ীতে?"

অজয় কহিল, "হাঁ বাড়ীতে—এই কল্‌কাতাতেই আমাদের বাড়ী—মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেরী হয়ে গেল।"

জ্যোৎস্না চিন্তিত ভাবে কহিল, "মা আছেন ?"

অজয় কহিল, "হাঁ, মা প্রাণে বেঁচে আছেন—কিন্তু তাঁকে আর চেনা যায় না—আমার আর ভাই টাই ত নেই—বাবা মারা গেছেন।"

জ্যোৎস্নার নারীহৃদয় সহানুভূতিতে ব্যথিত হইয়া উঠিল—সে বলিল, "ওঃ তাহলে ত তাঁর বড় কষ্টই গেছে—আজ তোমাকে ফিরে পেয়ে তাহ'লে তাঁর কত আহ্লাদই হ'ল। বাড়ী চিন্‌লে কি ক'রে ?"

অজয় কহিল, "সনৎ—আমার ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।"

জ্যোৎস্না পুনরায় চমকিয়া উঠিল। কিন্তু কোনও কথা কহিল না। অজয় বলিতে লাগিল,—"ছেলে স্কুল থেকে যাবার সময় পথে আমাকে দেখেই চিন্‌তে পারে—তার ডাক শুনে গাড়ী চাপা যেতে যেতে বেঁচে গেছি—তাকে দেখেই সব মনে পড়ে গেছে। সে-ই গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে যায়।"

জ্যোৎস্না নির্ব্বাক্ হইয়া অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া যেন আপনার মনেই কহিল, "ছেলে আছে। আর—"

অজয়ও যেন তাহার মাথা হইতে একটা গুরুভার বোঝা নামাইতে পারিলে বাঁচে, এইরূপ ভাবে জ্যোৎস্নার মনের কথা টানিয়া কহিল, "আছে জ্যোৎস্না—স্ত্রীও আছে।"

জ্যোৎস্নার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার চক্ষুতারকা

যেন কি এক অব্যক্ত আতঙ্কে নিস্পন্দ হইয়া স্ফটিকের মত জ্বলিতে লাগিল। তাহার সেই মৌনবেদনায় ব্যথিত হইয়া অজয় তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "ভয় কি জ্যোৎস্না— তোমার ভাবনা কি? আমার অতীতে যাই থাকুক না—তা'তে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধের কি কোনো তফাৎ হবে মনে কর? তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণে জড়িয়ে গেছ জ্যোৎস্না—তুমি যা আছ, আমার কাছে চিরদিন তা'ই থাক্‌বে—তা নিশ্চয় জেনো।"

অজয়ের সেই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব আবেগময় স্নেহোচ্ছ্বাসে জ্যোৎস্নার মনের বল বিগলিত হইয়া দুনয়ন দিয়া অশ্রুরূপে ঝরিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে দুইহস্তে তাহার অশ্রুপ্লাবিত আনন আচ্ছাদিত করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল— ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস-বেগে তাহার দেহলতা টেবিলের সঙ্গে কম্পিত হইতে লাগিল। অজয় ব্যগ্র হইয়া তাহার অবনত মস্তক বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। কিয়ংক্ষণ পরে জ্যোৎস্নার দুঃখোচ্ছ্বাস অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিলে, অজয় স্নেহ-কোমলস্বরে কহিল, "ছিঃ কাঁদতে আছে কি? ভয় কি? সে কি ভয় করবার মত লোক—তাকে তুমি দেখেছ যে?"

সেই কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না অজয়ের বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল।

অজয় বলিল, ' কাশীতে সেই গণকের বাড়ীতে যাকে গলার হার দিয়ে আস্‌তে দেখে ছিলে, সে-ই সনতের মা—অরুণা। আমি তাকে ভাল করে তখন দেখিনি—তাই চিনতে পারি নি।"

অজয়ের কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না চমকিয়া উঠিল—তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মনশ্চক্ষে সেই বিরহবিধুরা সাধ্বীসতীর করুণচিত্র সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গণকের চেলার চতুর ব্যবহারে তাহাদের হাস্যকে সেই নারী যে তাহার দুঃখের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল—সেই দৃশ্য স্মরণে আসিতেই জ্যোৎস্না বুঝিতে পারিল, অজয়কে দেখিয়া কেন অরুণা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। অজয় তাহাকে চিনিতে পারে নাই—কিন্তু সে ত অজয়কে চিনিয়াছিল! অজয়ের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া অরুণা কি ভাবিয়াছিল? লজ্জায় জ্যোৎস্না যেন এতটুকু হইয়া গেল। অরুণার মর্ম্মান্তিক মনঃক্লেশের কল্পনায়, জ্যোৎস্নার নিজের দুরদৃষ্টের জন্য তাহার অন্তরে যে বিরাট বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহার যেন অর্দ্ধপথে গতিরোধ হইল—জ্যোৎস্না আপনাকেই অরুণার নিকট অপরাধিনী জ্ঞান করিল। সেই কারণে জ্যোৎস্নার নিজের দুঃখ অরুণার দুঃখের সহিত তুলনায় যেন লঘু হইয়া গেল—মনের সেই প্রতিক্রিয়া, তাহার প্রাণে যে গভীর আঘাত লাগিয়া ছিল তাহার প্রকোপ প্রশমিত করিয়া, তাহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল।

সে রাত্রে পতি-পত্নীতে আর কোনও কথা হইল না। উভয়েই উভয়ের হৃদয়ের ঝঞ্ঝাবাত হৃদয়ে নিরুদ্ধ রাখিয়া নিদ্রার আশায় শয্যা গ্রহণ করিল। উভয়েরই নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে উঠিয়া অজয় দেখিল জ্যোৎস্না তৎপূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। অজয় বলিল, "সকালেই আমাকে মার কাছে যেতে হ'বে—তার আগে কিন্তু আমার পূর্ব্ব-ইতিহাসটা তোমার শোনা দরকার।" জ্যোৎস্নাকে মৌন দেখিয়া অজয় তাহার অতীত-জীবনের সকল কথা অকপটে জ্যোৎস্নার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিল—তাহার গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বের কোন কথাই গোপন রাখিল না। শেষে অজয় কহিল, "কাল মাকে যে রকম দেখে এলুম তা'তে আর সে মানুষ বলে বোধ হয় না—শরীরও যেমন ভেঙ্গে গেছে, মনেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। অত যে রাগী ছিলেন—যেন একেবারে মাটীর মানুষ হয়ে গেছেন।"

জ্যোৎস্না নিজের কথা ভুলিয়া অরুণার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া অজয় বলিল, "মা তোমাকে আজ নিয়ে যেতে বলেছিলেন।"

জ্যোৎস্নাকে নিরুত্তর দেখিয়া অজয় পুনরায় কহিল, "ভাব্‌ছ কি? তারা এখানে নেই—পিসিমার সঙ্গে কাশীতেই আছে—তাদের আন্‌তে মা লোক পাঠাবেন বলেছেন। তোমাকে নিয়ে যা'বার কথা বলাতে, তোমাকে জিজ্ঞেস না করে আমি

কিছু বল্‌তে পারিনি—একরকম কাটিয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু একবার ত গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌তে হবে? আমার সঙ্গে যাবে কি?"

জ্যোৎস্না চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে কহিল, "আগে তিনি কাশী থেকে আস্থন—তার পর যা হয় হ'বে।"

জ্যোৎস্নার স্বরের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া অজয় আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল না।

ধরণীবাবুকে অজয় পূর্ব্বরাত্রেই বলিয়া রাখিয়াছিল যে সেদিন প্রাতঃকালেই তাহাকে মাতার কাছে যাইতে হইবে। ধরণীবাবু জ্যোৎস্নার পতিভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য নিরতিশয় সন্তপ্ত ও চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, নিজের মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তা অন্তরে চাপিয়া, অজয়ের নিকট, তাহার জননী, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, এতদিন যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিজের সহৃদয়তার ও শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রাতে গাড়ী আসিতেই অজয় তাহার মাতার কাছে গমন করিল। পূর্ব্বরাত্রেই হৈমবতী তারযোগে অরুণাকে ও বিষ্ণু-প্রিয়াকে অজয়ের আগমন-বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যূষেই অজয়ের ও হেমাঙ্গিনীর শ্বশুরালয়ে লোক পাঠাইয়া-ছিলেন। অজয় বাটীতে যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই অজয়ের শ্বশুর প্রাণকৃষ্ণবাবু এবং ভগিনীপতি আনন্দমোহন, হেমাঙ্গিনীকে

সঙ্গে করিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। অজয়ের মস্তিষ্কে আঘাত-জনিত বিস্মৃতির বিস্ময়কর কথা এবং প্রবাসে ধরণীবাবুর সদয় ব্যবহারের কথা এবং কি অবস্থায় তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার কন্যার সহিত অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল সেই সকল কথা অজয়কে বারে বারে সকলের নিকট বর্ণনা করিতে হইল। সকলে সকল কথা বিশ্বাস না করিলেও যাহারা বালককাল হইতে অজয়কে অন্তরঙ্গ ভাবে জানিত, তাহারা অজয়ের কোন কথাই অবিশ্বাস করিল না। অজয়ের কাহিনী শুনিয়া কেহ বা অরুণার দুরদৃষ্টে, কেহ বা জ্যোৎস্নার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অধিকতর সহানুভূতি জানাইল। অরুণা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিবার জন্য হৈমবতী প্রাণকৃষ্ণবাবুকেই কাশীতে প্রেরণ করিলেন। অজয়ের নিরুদ্দেশকালে প্রাণকৃষ্ণবাবুই হৈমবতীর অনুরোধে সনতের পাঠাদির বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধান করিতেন।

আনন্দমোহন অজয়ের প্রবাসের কাহিনী শুনিয়া তাহার জীবনে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে অজয়ের প্রবাসে বিবাহের কথা শুনিয়া বিলক্ষণ কৌতুক উপভোগ করিল এবং সেই কথা লইয়া অজয়ের সহিত নানারূপ রহস্য পরিহাস করিতে ছাড়িল না। সে বিদায় লইবার সময় সহাস্যবদনে অজয়কে বলিয়া গেল, "খুব জোর কপাল করে এসেছিলে ভায়া! লোকে একটার ভারেই নুয়ে পড়ে

—ঘাড় তোল্‌বার সাবকাশ পায় না—তুমি ছ'ছুটো নিয়ে হাবু ডুবু খাও।" মুখরা ও প্রবলা হেমাঙ্গিনীর পতি-শাসনটা যে আনন্দমোহনের নিতান্ত মুখরোচক হইতে ছিল না—সে উক্ত মন্তব্যে সেই আভাষটা দিয়া যাইল। তাহার হৃদয়হীন পরিহাস-রসিকতায় অজয় যে কত ব্যথা পাইল সে সূক্ষ্মধারণার শক্তি আনন্দমোহনের ছিল না, কিন্তু আনন্দমোহন লোক মন্দ ছিল না—সে অজয়ের প্রত্যাবর্ত্তনে যথার্থ ই আনন্দিত হইয়াছিল। তাহার বিদ্রূপবাক্য সেই আনন্দের একটা উচ্ছ্বাস মাত্র।

হেমাঙ্গিনীও ভ্রাতার আগমনে আন্তরিক আহ্লাদিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘটনায় অরুণার দুঃখ-কষ্টের যে অবসান হইবে সে কথা ভাবিয়া হেমাঙ্গিনী তাহার মনের আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিল না। অরুণার প্রতি তাহার অপ্রীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই—তাহাকে গরিবের কন্যা বলিয়া সে চিরদিনই তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছে—এখনও করে। অরুণার দুঃখ যত বড়ই হউক হেমাঙ্গিনীব কাছে তাহা তুচ্ছ। হৈমবতীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াতে—পুত্র-বিরহের দুঃখানলে তাঁহার মনের শ্যামিকা দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে, তিনি অরুণার মনঃকষ্টের গভীরতা বুঝিয়া, তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন। সেই হেতু অরুণার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বা তাহার নামে 'লাগাইয়া' হেমাঙ্গিনী এখন আর হৈমবতীর নিকট প্রশ্রয় বা সহানুভূতি পাইত না। কিন্তু

তথাপি সে নিজের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; তাহার ধারণা ছিল ননদে-ভাজে—'সাপে নেউলে'র সম্বন্ধটাই স্বাভাবিক। অরুণার প্রতি ব্যবহারে সেই সম্বন্ধের সে ব্যতিক্রম করে নাই।

কিন্তু জ্যোৎস্নার পিতার ধন-সম্পত্তির কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তাহার সঙ্গে সেই ননদভাজের সম্বন্ধটার ব্যতিক্রম করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনীর মনে জ্যোৎস্নার প্রতি ননন্দা-স্নেহ এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে সে ধনীর গৃহিণী—পরের বাটীতে অযাচিত ভাবে যাইলে তাহার মর্য্যাদার লাঘব হইবে এইরূপ যে ধারণা তাহার মনে এতদিন বদ্ধমূল ছিল, সেই ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া সে নিজেই জ্যোৎস্নাকে আনিতে যাইবার প্রস্তাব করিল। এই ব্যগ্রতার প্রধান কারণ জ্যোৎস্নার পিতার ধনখ্যাতির আকর্ষণ, আর একটী কারণ—জ্যোৎস্নাকে ঘরে আনিয়া অরুণার সুখের অন্তরায় ঘটাইবার উল্লাস। অবশ্য দ্বিতীয় কারণের কথা প্রকাশ্য ভাবে বলিলে হেমাঙ্গিনী নিজেই হয়ত মিথ্যা বলিয়া তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিত—কিন্তু সেই ইচ্ছাটী যে তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নূতন ভাজের প্রতি স্নেহের উদ্রেক করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হৈমবতী অজয়ের নিকট পুনরায় জ্যোৎস্নাকে আনিবার কথা উত্থাপন করাতে অজয় তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল যে

জ্যোৎস্নাকে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই—অরুণা কাশী হইতে না আসিলে সে আসিতে সম্মত নহে। আর জ্যোৎস্না আসিলেও তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী সন্তুষ্ট হইবেন কি না সে বিষয়ে অজয়েব মনে আশঙ্কা হয়, একে ত হিন্দুর ঘরে যে বয়সে সচরাচর কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে সে বয়স বহুদিন অতিক্রম করিয়া যাইলে তবে জ্যোৎস্নার বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে আবার সে বাঙ্গালাদেশের কুলবধূগণের আচার ব্যবহাব কিছুই জানে না—সেইজন্য তাহাকে গৃহে আনিয়া হয়ত হৈমবতী হতাশ হইবেন। হৈমবতী সে সকল কথা শুনিয়া কহিয়াছিলেন, "তা যাই হো'ক, তোকে যখন প্রাণে বাঁচিয়েছেন—পথের ভিখিরী জেনেও বড়মানুষের মেয়ে হয়ে বিয়ে করেছেন, তখন তিনি এলে আমি তাঁকে বুকে করে তুলে নেবো। তা—আসুন না হয় বড় বৌমা—তার পরেই তাঁকে নিয়ে আসব।"

হেমাঙ্গিনীর কিন্তু সে কথা মনোমত হইল না, সে বলিল, "না মা সে কি ভাল দেখায়? আমি আজই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি।"

হৈমবতী তাহার আগ্রহে বাধা দিলেন না। হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ দাসদাসী দ্বারবান সঙ্গে করিয়া বাড়ীর গাড়ীতে ধরণী-বাবুর বাসায় যাত্রা করিল। জ্যোৎস্না তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে যত্ন আদর-অভ্যর্থনা করিতে ক্রটী করিল না। হেমা-

ঙ্গিনীও কথায় এরূপ শিষ্টাচার দেখাইল যে সে যে সেই অজয়ের বর্ণিত হেমাঙ্গিনী, তাহা জ্যোৎস্না প্রথমে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই, তাহাকে লইয়া যাইবার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া, জ্যোৎস্না বুঝিতে পারিল যে অরুণার উপর হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র স্নেহ মমতা নাই এবং তজ্জন্য হেমাঙ্গিনীর প্রতি জ্যোৎস্নার শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া যাইল। জ্যোৎস্না অতি বিনীত ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত হেমাঙ্গিনীর প্রস্তাব পরিহার করিল। বিদায় দিবার সময় জ্যোৎস্না হেমাঙ্গিনীকে কহিল, "মার চরণ দর্শন করতে ত যেতেই হবে বোন—সে জন্যে তোমাকে বল্‌তে আস্‌তে হ'বে কেন? দিদি এখন তাঁর ঘর শূন্য করে বিদেশে রয়েছেন এখন কি আমি যেতে পারি? তিনি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসুন—তারপর আমি নিজেই যা'ব।"

অগত্যা হেমাঙ্গিনী ভগ্নমনোরথ হইয়া বিরসবদনে ফিরিয়া আসিল। অরুণার দর্প চূর্ণ করিবার এমন সুযোগ ঘটিয়াও ঘটিল না দেখিয়া হেমাঙ্গিনী নিরতিশয় নিরাশ ও ক্ষুব্ধ হইল। সে বুঝিতে পারিল না জ্যোৎস্নার এই সপত্নীর প্রতি মমতা দেখাইবার প্রকৃত কারণ কি? ইহা কি—'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'—না পিতার ঐশ্বর্য্যের গরিমা? হেমাঙ্গিনী নিজের মনের মাপকাঠিতে জ্যোৎস্নার হৃদয়ের পরিমাণ করিতে যাইল। সে ভ্রমে পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যেদিন অজয় কলিকাতায় পূর্ব্বস্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বাটীতে ফিবিয়া আসিয়াছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে অরুণা বারাণসীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল এমন সময় পূর্ব্বোক্ত গণকঠাকুরের প্রধান চেলা অরুণাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই যে মা ঠাকরুণ গঙ্গাস্নানে চলেছেন—তাহ'লে ঠিক সময়েই এসেছি।"

অরুণা তাহার পরিচাবিকাকে বলিল, "ঠাকুরকে বস্‌তে আসন দাও।"

গ্রহাচার্য্যের চেলা উপবেশন করিয়া কহিল, "আমরা আপনার কাছ থেকে সেই হার ছড়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে-ছিলেম ভাব্‌বেন না। ত্রিপুণ্ডকঠাকুর কাল রাত্রে মাঝগঙ্গায় ডুব দিয়ে মাটি তুলে শ্মশানে বসে রীতিমত তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী শিব-পূজা করেছেন—এখন স্বর্ণশিব গড়িয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করাতে পার্‌লেই হয়। তবে গোল হয়েছে এই যে ত্রিপুণ্ডক ঠাকুরের হাতের মুঠোটা কিছু বড় কিনা? তাই এক মুষ্টিতে পোয়াটাক ওজনের গঙ্গামৃত্তিকা তুলে ফেলেছেন—এই দেখুন না সেই মৃত্তিকায় এই শিবলিঙ্গ প্রস্তুত হয়েছে।" এই কথা বলিয়া

দৈবজ্ঞের চেলা তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী ভিজা মৃত্তিকার মহাদেব বাহির করিয়া অরুণাকে দেখাইয়া পুনরায় কহিল, "এখন কথা হচ্ছে এই যে ২৫ ভরি খাঁটি সোণা না হলে ত এত বড় নিরেট স্বর্ণশিব তৈরী হবে না ? আপনার হার বিক্রী করে ২২॥ ভরি খাঁটী সোণা খরিদ করা হয়েছে। এখন পূজার খরচ, স্বর্ণশিবের আর ২॥ ভরি সোণা, স্বর্ণের বিল্বপত্র, রূপার ত্রিশূল আর ষাঁড়, ত্রিপুণ্ডক ঠাকুরের দক্ষিণা, এইসব নিয়ে হিসেব ক'রে দেখা গেছে আর ১৯৯৸৫ দিলেই সব ঠিক্ ঠাক্ হয়ে যায়। সেই টাকাটা জোগাড় যন্ত্র করে দিয়ে দিন—পূজোটা করিয়ে দেই—তাহলে দেখ্‌বেন, বাবাজি কেদারনাথেই থাকুন আর রামেশ্বরেই থাকুন সুড় সুড় ক'রে বাড়ী আস্‌তে পথ পাবেন না।"

দৈবজ্ঞের বাটীতে অজয়কে দর্শন করিবার প্রথম মোহ কাটিয়া যাইবার পর অরুণার মনে হইয়াছিল বুঝি দৈবজ্ঞকে কণ্ঠহার দেওয়া তাহার বৃথা হইল। কিন্তু যখন বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে বুঝাইলেন যে পরনারীর সঙ্গে একত্রে আসিয়া যে পুরুষ তাহাকে উপহাস করিয়াছে সে কখনই অজয় হইতে পারে না, তখন হইতে সে যে অজয়কেই দেখিয়াছে তাহার মনের সেই বিশ্বাস টলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অরুণার মনে প্রথমে যে সন্দেহ সহসা উদিত হইয়াছিল তাহাই মধ্যে মধ্যে পুনরুদিত হইত—বুঝি বা দৈবজ্ঞই মন্ত্রশক্তি

বলে অজয়কে সশরীরে তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন—পরনারীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস অরুণারই মন পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রজাল। সেইরূপ চিন্তায় অরুণার মন হইতে অজয়ের উপর অভিমান ও তাহার চরিত্রহীনতার জন্য ক্ষোভ বিচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

গণকের চেলার কথা শুনিয়া তাহার দাবী পূরণের জন্য অরুণা তাহাকে আর কি অলঙ্কার দিবে তাহা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় টেলিগ্রাফের পিয়াদা হৈমবতীর প্রেরিত টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়া উপস্থিত করিল। তৎক্ষণাৎ সরকার রামহরি পার্শ্বের বাটীর পেন্সন্‌প্রাপ্ত কাশীবাসী লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া উহা পাঠ করাইয়া আনিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া অরুণাকে শুনাইয়া, সকলকে জানাইল—অজয় পূর্ব্বদিন বাটী ফিরিয়াছে—অরুণাকে ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিতেছে।

গণকের চেলার, সেই সংবাদ শুনিয়া, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তার বদন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লেন গ্রহশান্তির প্রত্যক্ষ ফল—হাতে হাতে প্রমাণ পেলেন ত?"

পরিচারিকা বলিল, "বাবু যখন বাড়ীতে ফিরে এসেছেন—তখন আর পূজোর দরকার কি?"

গণকের চেলা বলিয়া উঠিল, "বিলক্ষণ! আধাআধি গ্রহশান্তি করে রাখ্‌লে—আবার নিরুদ্দেশ হ'তে কতক্ষণ?"

সেই কথা শুনিয়া অরুণার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, "ওঁকে বস্‌তে বল।"

গণকের চেলাকে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র; সে বসিয়াইছিল—উঠিবার কোনও লক্ষণই সে দেখায় নাই; অরুণা উপর হইতে তাহার হস্তের ছয় গাছি গিনিসোণার চুড়ী আনিয়া গণকের চেলার সম্মুখে রাখিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "ঐতে পূজোর খরচ কর্‌তে বল—বার ভরি গিনি সোণা আছে।"

গণকের চেলা চুড়ী কয়গাছি উঠাইয়া লইয়া, "মা লক্ষ্মীর হাতের লোহা অক্ষয় হো'ক—বাবু আর য'াতে বিবাগী না হ'ন, তা'র যোগাড় আমরা করে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রামহরি ও পরিচারিকা অরুণার অনর্থক অর্থ দান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—কিন্তু প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হইল না।

অজয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি অরুণাকে কহিলেন, "বাড়ী গেলেই শুন্‌তে পা'বে, বাছা আমার কেন খবর দিতে পারেনি;

অজয় কি আমার তেমনি ছেলে—ঝগড়া কোঁদলে জ্বলে পুড়ে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল।”

অরুণার সেদিন আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে প্রাণকৃষ্ণবাবু কলিকাতা হইতে তাহাদের লইয়া যাইতে আসিলেন। পিতার মুখে অরুণা অজয়ের প্রবাসের সমস্ত কথা একে একে অবগত হইল। রেলে সংঘর্ষ, মস্তিষ্কে আঘাত, আত্মবিস্মৃতি, ধরণীবাবুর গৃহে আশ্রয় প্রাপ্তি, জ্যোৎস্নার সহিত বিবাহ, বারাণসী হইয়া কলিকাতায় গমন, সনতের সহিত সাক্ষাৎ ও পূর্ব্বস্মৃতির প্রত্যাবর্ত্তন—সকল কথা শুনিয়া অরুণার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে যেন আপনার মনেই কহিল, “তাহ’লে গণক ঠাকুরের বাড়ীতে তাঁদেরই দেখে ছিলুম—ভুল হয় নি!”

প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “তুমি চিনে ছিলে, কিন্তু অজয় তোমাকে চিন্‌তে পারে নি।”

অরুণা সে কথার প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু সে কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না। এমনও কি কখনও হয়? দিনের বেলায় অত কাছে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে নাই—ইহা কি সম্ভব! আঘাত-জনিত আত্মবিস্মৃতির কথাটাও অরুণার প্রত্যয় হইল না। সেরূপ কথা সে কখনও শুনে নাই—পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণ সেরূপ ঘটনার যে সকল সাক্ষ্য ও প্রমাণ দিয়াছেন

তাহা অরুণার অজ্ঞাত ছিল। সে ভাবিল প্রাচীন কালে, যখন লোকে সকল অলৌকিক ঘটনাই নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিত—তখনও এরূপ অদ্ভুত কথার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইত। তাহা না হইলে দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে বিস্মৃতি রূপ অমার্জ্জনীয় দোষস্খালনের জন্য মহাকবি কালিদাসকে দুর্ব্বাশার অভিশাপ ঘটনার অবতারণা করিতে হইত না। আর সেদিন অজয় তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল কি—না পারিয়াছিল তাহাতেও কিছুই আসিয়া যায় না—কারণ অজয় যে তাহার নব-পরিণীতাকে কত ভালবাসে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ত আর অরুণার ভ্রম হয় নাই? অজয় যে শুধু ঘটনা-চক্রে পড়িয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছে তাহা নহে—সে যে তাহাকে ভুলিয়া সেই নূতন পত্নীকে অত ভালবাসিতে পারিয়াছে, ইহা অরুণার পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। সে ভাবিল প্রথমতঃ ত অজয়ের স্ত্রীপুত্র আছে কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিত না হইয়া বিবাহ করাই উচিত হয় নাই, তাহার পর বাটীতে ফিরিয়া সে ত বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার সেই তথাকথিত আত্ম-বিস্মৃতিতে সে অরুণার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং তজ্জন্য সে অরুণার কাছে কত অপরাধী? সেই অপরাধের গুরুত্ব যদি অজয় বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কি অনুতপ্ত হইয়া নিজে অরুণার কাছে আসা উচিত ছিল না? যে সংসারে অরুণার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ একাধিপত্য ছিল, যে প্রাণাধিক স্বামীর ভালবাসার

উপর অপর কাহারও দাবী করিবার স্বপ্নেও সম্ভাবনা ছিল না, সেই সংসারে তাহার ভালবাসার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আনিয়া অজয় তাহাকে তাহার ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছে। এরূপ স্থলে অজয় নিজে আসিয়া তাহাকে একটা কৈফিয়ৎ—একটু সান্ত্বনা—দেওয়া কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল না? অভিমানে অরুণার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এক একবার ডাক-ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা তাহার মনে এতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল যে সে অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া কলিকাতায় গিয়া অজয়কে দেখিবাব জন্য ব্যগ্র হইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অরুণাকে দ্রব্য-সামগ্রী গুছাইতে সাহায্য না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "নাও না বৌমা, শীগ্‌গির সব গুছিয়ে নাও না—শেষে তাড়াতাড়ি করে পেরে উঠ্‌বে কেন?"

অরুণা নতমুখে গাঢ়স্বরে উত্তরদিল, "না পিসিমা—আমি এখন যা'ব না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে আবার কি! এই—বাছাকে ফিরে পাবার জন্যে প্রাণ বার করছিলে—আর বাছা ঘরে ফিরে এসেছে, এখন তুমি ঘরের বৌ ঘরে যা'বে না?"

অরুণা ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "সে ত আর একজন এসেছে

পিসিমা—আমাকে আর দরকার কি ?" বলিতে বলিতে অরুণার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিতে লাগিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া অরুণার দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া কহিলেন, "ও মা! সেই জন্যে! সতীনের ভয়ে নিজের ঘরে যাবে না? এমন বোকা মেয়েও যে কলিকালে আছে তা ত জানতুম্ না। সে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল আর তুমি এখানে গুমোর করে বসে থাক্‌বে? তা হলে সত্যি সত্যিই যে বে-দখল হয়ে যাবে মা।"

অরুণা কাতর-কণ্ঠে উত্তর দিল, "গুমোর নয় পিসিমা—বাবা বিশ্বনাথ আমার সে গুমোর রাখ্‌লেন কৈ? বে-দখল ত হয়েই গেছি পিসিমা—নতুনকে ফেলে কে পুরোণোর দিকে ফিরে চায়? তবে আমি আর কেন সেখানে গিয়ে তার সুখের পথে কাঁটা হ'ব? তিনি বেঁচে আছেন—ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে এসেছেন—তা ত শুনলুম? সেইভাল। আর সেখানে গিয়ে শুধু শুধু নিজের মান নিজে খোয়াতে যাব কেন পিসিমা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যথিত-স্বরে উত্তর দিলেন, "মান খোয়াতে হবে না রে পাগলি—মান খোয়াতে হবে না। তুমি ঘরের লক্ষ্মী রাজরাণী—কার সাধ্যি তোমাকে খাটো করে? রূপে গুণে অমন বৌ একালে কটা লোকের ভাগ্যে ঘটে—তা কি আমার অজয় জানেনা—না বোঝে না? কপালের ফেরে পড়ে একটা কাজ করে ফেলেছে—তা'র আর উপায় নেই। তা সে

জন্যে তুমি কেন নিজের গণ্ডা ছেড়ে দিতে যাবে? আর তুমি নিজে না ছেড়ে দিলে কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না—তা বলে দিলুম। এই আমরাও ত সতীন নিয়ে ঘর করেছি—ছেলে পুলে হয়নি—বিয়ে করে ছিল—তাকে ছোট বোনের মতনই দেখতুম—মরে গেলে কত কেঁদেছিলুম্।"

অরুণা ম্লানমুখে উত্তর দিল, "তোমরা সে-কালের লোক —তোমরা সে সব পারতে—আমরা যে সে রকম শিখিনি পিসিমা? আমি যাবো না পিসিমা,—আমাকে সেখানে যাবার কথা আর বোলো না।"

অগত্যা বিষ্ণুপ্রিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "তবে আর কি করবো বল—তোমাকে ত এখানে একলা ফেলে রাখতে পারবো না? আমাকে এসে থাকতেই হবে। কিন্তু বাছাকে আমার একবার না দেখে এলে ত বাঁচ্‌ব না—যাই একবার আজ—দু'চার দিন পরেই আবার ফিরে আস্‌ব। এ ক'টা দিন বেয়াই তাহ'লে এখানে তোমার কাছে থাকুন—আমি রামহরিকে নিয়ে যাই। পারি ত অজয়কে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ব—তার জিনিস সে নিজে এসে নিয়ে যা'ক।"

সেই কথা শুনিয়া অরুণা শঙ্কিতা হইয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার দুটী পায়ে ধরি পিসিমা—তাঁদের কাছে এসব কথা কিছু বোলোনা।"

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না। তিনি রাম-

হরিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য সেই রাত্রের গাড়ীতে কাশী ত্যাগ করিলেন। আসিবার সময় অরুণা তাঁহাকে, সনৎকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু কন্যার কাছে রহিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিদায় দিয়া আসিয়া অরুণা গৃহতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে ক্রন্দনের বেগ থামিয়া আসিলে, সে মুক্ত গবাক্ষের ধারে উঠিয়া বসিয়া নক্ষত্র-খচিত অন্তরীক্ষের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া গৃহের কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার জড়দেহকে ফেলিয়া রাখিয়া যেন তাহার মুক্ত-আত্মা অন্ধ-তমসমাচ্ছন্ন মহাশূন্য ভেদ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবেগে কলিকাতার পথে অবিরাম ছুটিয়া চলিল। তাহার মনের সেই কাল্পনিক গতির প্রচণ্ড বেগে অরুণা কিয়ৎক্ষণ পরে সত্য সত্যই ক্লান্তশ্রান্ত হইয়া ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল এবং বিনিদ্রনয়নে সারারাত্রি অতিবাহিত করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে অজয়ও ভাবিতেছিল—তাহারও ভাবনার অন্ত ছিলনা। অরুণাদের কাশী হইতে লইয়া আসিবার জন্য প্রাণকৃষ্ণ-বাবু হাবড়া ষ্টেশনে যাত্রা করিবার পর অজয় ধরণীবাবুর বাসায় আসিয়া দেখিল তিনি বিষয়কর্ম্মের খাতা পত্র দেখিতে গভীর-ভাবে অভিনিবিষ্ট। তিনি অজয়ের সহিত দুই একটী কথা কহি-লেন মাত্র। অজয় বুঝিতে পারিল, ধরণীবাবু বিশেষ চিন্তায় পতিত হইয়াছেন এবং সেই চিন্তা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্যই তিনি কারবারের জমাখরচ হিসাব নিকাশে মনোনিবেশ করিয়াছেন। জ্যোৎস্নার কক্ষে আসিয়া অজয় দেখিল জ্যোৎ-স্নার মুখেও গভীর চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। তাহার প্রফুল্লতা—সেই মনোমোহকর বাচালতা যেন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ যেন অজয় ও তাহার মধ্যে একটা কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে। অজয় যে তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিবে—জ্যোৎস্নার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সে সাহস হইল না।

এই ভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। সে প্রাতঃকালে বাটীতে মাতার কাছে যায়, মধ্যাহ্নে ধরণীবাবুর আপিসে যাইয়া

তাঁহার কর্ম্মচারীদের সহিত আমদানি রপ্তানির আলোচনা করে, অপরাহ্নে পুনরায় মাতার কাছে যায় এবং সন্ধ্যার পর অপরাধীর মত জ্যোৎস্নার কাছে আসিয়া, তাহার সহিত দুই একটী কথা সঙ্কুচিত ভাবে কহিয়া, বাক্যালাপ জমাইবার বৃথা চেষ্টা করে।

তৃতীয় দিবসে বিষ্ণুপ্রিয়া কাশী হইতে আসিলেন এবং হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহধারায় অজয়কে অভিসিক্ত করিলেন। তাহাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করিয়া, তাহার নিরুদ্দেশ-বাসের সকল কথাই পুনরাবৃত্তি করাইলেন। অজয়ের মন কিন্তু অন্যত্র পড়িয়াছিল। তাঁহার সহিত অরুণা আসে নাই শুনিয়া অজয়ের মন অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ছিল—তাহার মনের উদ্বেগ গোপন রাখা ক্রমশঃ এতই অসম্ভব হইয়া উঠিল, যে সে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া পিতৃশ্বসার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহির্বাটীতে তাহার পাঠাগারে নির্জ্জনে গিয়া বসিল।

পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অবধি সে জ্যোৎস্নার কথাই ভাবিতে ছিল। মুক্তপক্ষ আকাশ-বিহারিণী বিহঙ্গিণীকে, সে যে পিঞ্জরে পুরিয়া শেষে পিঞ্জর-শুদ্ধ কূপের জলে ডুবাইতে বসিয়াছে—সেই চিন্তার তাপেই সে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। অরুণার জন্য অজয় সেরূপ ভাবে চিন্তিত ছিল না। অজয় নিরুদ্দিষ্ট ছিল বলিয়া অরুণা মনঃক্লেশ ভোগ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে জন্য অজয় তাহার কাছে অপরাধী নহে—অজয়ের প্রাণরক্ষা করিয়াছে বলিয়া বরং অরুণাই জ্যোৎস্নার কাছে ঋণী। অরুণা যাহা

হারাইয়াছিল, এখন অজয়ের পুনরাগমনে সে সমস্ত ফিরিয়া পাইবে—স্বামী, সংসার সমস্তই তাহার বজায় থাকিবে। কিন্তু জ্যোৎস্না যাহা হারাইতে বসিয়াছে তাহা সে আর ফিরিয়া পাইবে না। সে অজয়কে নিজস্ব জানিয়াই প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছিল। এখন ভাগ্যচক্রে সেই স্বামী পরের হইয়া গেল! জ্যোৎস্না পাষাণ ভিত্তি মনে করিয়া যে সুখের অট্টালিকা গড়িয়াছিল—সহসা সেই ভিত্তি শিথিল বালুকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার সাধের অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অজয়ের হৃদয়ের সহানুভূতি জ্যোৎস্নার দিকেই প্রধাবিত হইত। জ্যোৎস্নার মলিন মুখ প্রত্যক্ষ দর্শনে এবং তাহার অতীত জীবনের গতি অনুধাবন করিয়া, অজয় তাহার যে ক্ষতি করিয়াছে, সে জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে যেন অধিকতর অনুতপ্ত হইতে ছিল। অরুণার জন্য সন্তপ্ত হইবার সেরূপ কোনও কারণ আছে বলিয়া অজয়ের মনেই হইত না। অজয় মনে করিয়াছিল তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেই অরুণা ছুটিয়া আসিবে এবং আপনার ন্যায্য অধিকারে অধিষ্ঠিতা হইলেই, তাহার বিগত দুঃখ-ক্লেশ ঘুচিয়া যাইবে—তাহার জন্য আর চিন্তা কি? অরুণা কাশী হইতে আসে নাই—ইচ্ছা করিয়াই আসে নাই শুনিয়া, অজয়ের সেই ধ্রুবধারণায় আঘাত লাগিল—আত্মাভিমান যেন খর্ব্ব হইয়া গেল।

অরুণা আসিল না কেন? এই প্রশ্ন মনে উঠিতেই অজয় বুঝিতে পারিল অরুণারও অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—তাহার

পূর্ব্ব অধিকার ঠিক অক্ষুণ্ণ নাই। অজয়ের স্মরণ হইল যে, নারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু স্বামীর ভালবাসার উপর অধিকার স্বেচ্ছায় পরকে ছাড়িয়া দিতে পারে না—আজ অরুণা সেই নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকারে বঞ্চিতা হইতে চলিয়াছে—ইহা কি কোনও নারী সহ্য করিতে পারে? এই সরল সত্য অজয়ের মনে প্রতিভাত হইতেই গণকের বাটীতে সে যে বিরহবেদনাতুরা শোকভারাবনতা নারীর বিষণ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল তাহা যেন তাহার মানস-পটে উজ্জ্বলতর হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সেই দীনা বিরহবিধুরা বিষাদিনী মূর্ত্তির পার্শ্বে জ্যোৎস্নার নৈরাশ্য-পীড়িতা মূর্ত্তি যেন ম্লান হইয়া আসিল। সুদূর অতীত ভেদ করিয়া অজয়ের মনশ্চক্ষে তাহার বহুদিন-বিস্মৃত দাম্পত্য-জীবনের সামান্য সামান্য কত ঘটনা একের পর আর উপর্য্যুপরি ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে যে অরুণাকে কত ভালবাসিত আর অরুণাও যে সেই ভালবাসার কিরূপ ভাবে প্রতিদান করিত—অরুণা যে অজয়ের কৈশোর-যৌবনের প্রেমের স্বপ্ন ধীরে ধীরে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার হৃদয় মন ভরিয়া রাখিয়াছিল, সে যে আপনার সুখদুঃখ সমস্ত ভুলিয়া, শাশুড়ীর অবিরত গঞ্জনা হাসিমুখে সহিয়া, ধনীর পুত্রবধূ হইয়া নিতান্ত দীনদুঃখিনীর স্বাধীনতাতেও বঞ্চিতা—উপেক্ষিতা হইয়াও কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া, অনবদ্য সন্তোষে—প্রীতি ও প্রেমের প্রস্রবণে তাহাকে নিয়ত স্নিগ্ধ করিয়া রাখিত। অজয় যে

অসামান্য স্ত্রীসৌভাগ্যের জন্য, আত্মীয় বন্ধুগণের অভিনন্দিত হইত এবং নিজে সংসারের বাদ-বিসম্বাদের মধ্যেও সতত তৃপ্ত - মুগ্ধ হইয়া থাকিত! সেই সকল কথা অজয়ের মনে বন্যার বেগে আসিয়া তাহার অন্তরে অনুতাপের প্লাবন উপস্থিত করিল। সতীলক্ষ্মীর সেই দুর্লভ স্বামি-প্রীতির সে কি এই প্রতিদান দিল—সপত্নী আনিয়া তাহাকে স্বাধিকার-চ্যুত দেখিবার জন্য তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল? ছি!

অজয়ের নিজের অদৃষ্টের উপর ধিক্কার জন্মিল। সে ভাবিয়া দেখিল—সে যে জ্যোৎস্নাকে ঘটনাচক্রে বিবাহ করিয়াছে মাত্র কিন্তু তাহাকে স্বামীর ভালবাসা দেয় নাই, একথা বলিয়া সে যে অরুণাকে সান্ত্বনা দিবে তাহার উপায় নাই। সে যে জ্যোৎস্নাকে প্রকৃতই ভালবাসে—পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ত তাহার ধারণা ছিল সে জ্যোৎস্নাকে যেরূপ হৃদয়মন ঢালিয়া ভালবাসে তাহার অধিক কোনও স্বামীই স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারে না। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? অজয়ের মনে সন্দেহ উঠিল—বুঝিবা তাহার ভ্রম হইয়াছিল—সে বোধ হয় জ্যোৎস্নাকে যেমন ভালবাসে অরুণাকে তেমনই ভালবাসে! অজয় নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই চমকিয়া উঠিল—তাহাও কি হয়? পত্নীপ্রেমের কি এরূপ বিভাগ হয়? সে প্রাচীন কালের বহুপত্নীক পতিগণের একাধিক স্ত্রীর সহিত তুল্যরূপ ব্যবহারের চিত্র স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার

স্মরণ হইল, সেকালের হিন্দুনারী পতিকে দেবতা ভাবিয়া তাহার ভালবাসার বিন্দুমাত্র পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত—একালে ত সে ভাব নাই? খ্রীষ্টীয় সমাজে এক পত্নীর বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ শুধু আইন অনুযায়ী দণ্ডার্হ নহে, তাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য। আর প্রাচীন সমাজের আর্য্যসতী-গণের সেই অসামান্য পতিভক্তি নারীর পক্ষে যতই পুণ্যময় ও গৌরবকর হউক—স্বার্থপর পুরুষের পক্ষে যে তাহা নিতান্তই লজ্জাকর তাহা ভাবিয়া অজয় মরমে মরিয়া গেল। সে বুঝিল যে অরুণাকে ও জ্যোৎস্নাকে সে কখনই সমানভাবে ভালবাসে না—সে ভালবাসার একটা পার্থক্য আছেই। নহিলে সে এ কয়দিন অরুণার কথা না ভাবিয়া জ্যোৎস্নার মনঃকষ্টের কথাই ভাবিতেছিল কেন? লোকে বলিয়া থাকে বটে—স্নেহ নিম্নগামী, ও নূতনের আকর্ষণ অধিক—জ্যোৎস্না কনিষ্ঠা বলিয়া হয়ত অজ-য়ের মনও সেই চিরন্তন পন্থার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। নহেত বহুদিন অদর্শন ও বিস্মৃতিতে অরুণার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়া জ্যোৎস্নার প্রতিই তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে। কথাটা কিন্তু অজয়ের ঠিক মনে লাগিল না। একাধিক ব্যক্তির কোনও ক্ষতি করিয়া ফেলিলে—তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পর তাহার ক্ষতির জন্য সহৃদয় ব্যক্তি যত লজ্জিত হয় আপনার লোকের জন্য ততটা হয় না—আত্মীয় অপেক্ষা পরের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠে। সেই কারণেই বা

অজয় জ্যোৎস্নার মনঃকষ্টের জন্য অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—অরুণাকে সে আপনার জন ভাবে বলিয়া তাহার কথা ততটা ভাবে নাই? জ্যোৎস্নার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ব্যথিত হইবার অন্য একটা কারণ—তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা নহে কি? অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধের কৃতজ্ঞতাজনিত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা—আর প্রথম যৌবনের স্বতঃউচ্ছ্বসিত পত্নীপ্রেম কি এক? কিন্তু অজয়ের যদি জ্যোৎস্নার ও অরুণার প্রতি ভালবাসার তারতম্য থাকে এবং সেই ভালবাসার কারণও উভয়ের পক্ষে ভিন্নতর হয়, তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? জ্যোৎস্নার ও অরুণার তাহার প্রতি ভালবাসার ত কোনও পার্থক্য নাই—উভয়েই যে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে বিষয়ে ত অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহারা যে উভয়েই অজয়ের হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার দাবী করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি? অজয় কিছুই স্থির করিতে পারিল না—সে কেবল আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল।

সন্ধ্যার পর চিন্তাক্লিষ্ট-বদনে ব্যথিত-হৃদয়ে অজয় ধরণীবাবুর বাসায় গিয়া দেখিল জ্যোৎস্না দীপালোকে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পাঠ করিতেছে। জ্যোৎস্না ইংরাজি ভালরকমই শিখিয়াছিল, হিন্দীও জানিত—বাঙ্গালা সামান্যই জানিত। অজয়ের সাহায্যেই তাহার বাঙ্গালা শিক্ষার উন্নতি হইয়াছিল এবং বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি মমতা জন্মিয়াছিল। বহু

দিন পূর্ব্বে সে একবার অজয়ের সহিত একত্রে বসিয়া কপাল-কুণ্ডলা পাঠ করিয়াছিল—আজ সে নিজেই সে বহিখানি বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছিল।

অজয় গৃহে প্রবেশ করিতে জ্যোৎস্না পূর্ব্বদিনের মত পুস্তকেই দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিল না, একবার করুণ-দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। অজয়ের মুখে তাহার অন্তরের দ্বন্দ্ব-জনিত যাতনা প্রতিবিম্বিত দেখিয়া জ্যোৎস্না পূর্ব্বের মতই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি ? চেহারা অমন হয়ে গেছে কেন ?"

জ্যোৎস্নার স্বরে ও কথার ভঙ্গীতে তাহার স্বভাবসিদ্ধ আবেগ ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া অজয়ের মনের গুরুভার যেন অনেকটা লাঘব হইয়া গেল। তাহাদের কথোপকথনে দুইদিন যে একটা অস্বাভাবিক বাধা আসিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিবার জন্য অজয় সহজ ভাবেই প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কেন ? মুখে কি দেখ্‌লে ?"

অজয়ের সহিত পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় সে এরূপ শৈশব-সুলভ সরলভাবাপন্ন হইয়াছিল যে জ্যোৎস্না তাহার মুখ দেখিলেই মনের কথা অনুমানে বলিতে পারিত। ক্রমে জ্ঞান ও স্মৃতির পুনরুন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের সেই আত্মগোপনের অভাব বিদূরিত হইলেও, জ্যোৎস্নার নিকট তাহার মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার শক্তি ছিল না। এক্ষণে জ্যোৎস্নার সেই শক্তিতে

অজয়ের সন্দেহসূচক প্রশ্ন শুনিয়া, জ্যোৎস্নার মলিন মুখেও হাসি আসিল। কিন্তু অজয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতেই জ্যোৎস্নার সেই হাসি চকিতে মিলাইয়া গেল। সে গম্ভীরভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বলই না—কি হয়েছে ?"

অজয় ধীরে ধীরে কহিল, "সে এল না।"

জ্যোৎস্না কহিল, "কে এলেন না—দিদি ? তিনি আস্‌বেন না ত—তুমি নিজে আন্‌তে গেলে না কেন ?"

জ্যোৎস্নার কথা শুনিয়া অজয় বিস্মিতভাবে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার ম্লানমুখমণ্ডল নির্ব্বিকার—তাহার আয়ত নয়নের দৃষ্টি করুণ ও কোমল। জ্যোৎস্না যে অরুণাকে এরূপ ভাবে উল্লেখ করিবে, অরুণার মনের ভাব অনুমান করিয়া তাহার হইয়া কথা কহিবে, অজয় তাহা প্রত্যাশা করে নাই। সে জ্যোৎস্নার প্রশান্ত স্বরে ও সহজ ভঙ্গীতে সাহস পাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি গেলেই যে আস্‌ত—তাই বা তুমি জান্‌লে কি করে ?"

জ্যোৎস্না উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই যে আস্‌তেন তা বলতে পারি না—কিন্তু খুব সম্ভব আস্‌তেন।"

অজয় দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।"

জ্যোৎস্না অজয়ের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত

করিয়া কহিল, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? যা'তে তিনি আসেন—তা'র বিহিত কর্‌তে হবে।"

অজয় জ্যোৎস্নার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-নয়নে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার ম্লান মুখের করুণ দৃষ্টিতে তাহার মনের কথা অজয় কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ধরণীবাবু যে দিন অজয়কে লইয়া কলিকাতায় আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা জ্যোৎস্নার মনের কোণে দেখা দিয়াছিল। জ্যোৎস্না প্রকাশ্য-ভাবে তাহার পিতার প্রস্তাবে বাধা দিয়া অজয়ের বাঙ্গালা দেশে আসা বন্ধ করিতে পারে নাই—দীপ শিখায় আকৃষ্ট পতঙ্গের মত তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে কলিকাতার দিকে অজয়ের সঙ্গে টানিয়া আনিয়াছিল। সুতরাং অজয়ের গৃহ ও স্ত্রীপুত্র পুনঃ-প্রাপ্তির সংবাদ জ্যোৎস্নার নিকট একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আসে নাই—কিন্তু আঘাতটা যে এত গুরুতর হইবে তাহা জ্যোৎস্না অনুমান করিতে পারে নাই। আঘাত প্রাপ্তিব প্রথম বেদনায় জ্যোৎস্না আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া নিতান্ত অসহায়ার মতই কাতব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহৃদয়তা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে নিজের হৃদয়ের স্বার্থসুখান্বেষী দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হইল। সে যে নিজের অধীরতায় তাহাব স্নেহময় জনকের কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিতেছে, সেই কথা ভাবিয়া আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যেব প্রতি-কারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

অজয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী দুইদিন ধরণীবাবু জ্যোৎস্নাকে নৈরাশ্যে ও ক্ষোভে অভিভূতা দেখিয়া এবং তাহার দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজেই নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মনের সে অবস্থায় কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র ভাবিয়া তিনি সে চেষ্টা করেন নাই।

যে দিন সন্ধ্যাকালে অজয় আসিয়া অরুণার কাশী হইতে না আসিবার সংবাদ আনিয়াছিল সেইদিন ধরণীবাবুর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জ্যোৎস্না তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর সে পিতার ম্রিয়মান মুখের দিকে চাহিয়া সহসা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিল, পরে বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "বাবা, যা হ'বার তা হয়ে গেছে আর আমি কাঁদব না—আপনাকেও ভাবাব না। যা—হয়ে গেছে—ফেরবার নয়—তা'র জন্যে মিছে দুঃখ করে আর ফল কি?"

ধরণীবাবু কন্যার মস্তকের কুঞ্চিত অবেণীবদ্ধ কেশ-রাশিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাই ব'লে যদি তুমি মনকে প্রবোধ দিতে পার মা—তা হ'লে আমার আর ভাবনা কি। ভগবান কেন যে তোমাকে এমন পরীক্ষায় ফেল্‌লেন সেইটা বুঝ্‌তে পারিনি বলেই এত কষ্ট।"

জ্যোৎস্না প্রাণপণ শক্তিতে মনকে দৃঢ় করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "তার যখন কোনও উপায় নেই, তখন আর সে

কথা ভেবে মিছে কষ্ট পাচ্ছেন কেন বাবা? আমি আমার মনকে অনেকটা বুঝিয়ে এনেছি। এখন আমি যা বল্‌ব তা যদি শোনেন তা'হলে চাইকি সাম্‌লে যেতে পার্‌বো।

ধরণীবাবু কহিলেন, "তোমার কথা কবে না শুনেছি মা? তুমি কিছু অন্যায় কর্‌বে না তা আমি জানি। তুমি যা'তে সুখী হও আমি তাই কর্‌বো।"

জ্যোৎস্না কহিল, "তা হ'লেই হোলো বাবা—আজ থেকে আপনি আমাকে আর এক রকম দেখবেন।"

পিতাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া জ্যোৎস্নার মনের ভার অনেক কমিয়া গেল। নৈরাশ্যের প্রথম আক্রমণে জ্যোৎস্না নিজের ভাগ্যের সহিত তুলনায় অরুণাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়াছিল বলিয়াই তাহার দুঃখের তাড়না তীব্রতর বোধ হইয়াছিল। কিন্তু মনের প্রথম চাঞ্চল্য বিদূরিত হইলে সে যখন বুঝিতে পারিল অরুণার দুর্ভাগ্যও কম নহে। অরুণার স্বামীর মত স্নেহশীল, সহৃদয় ও চরিত্রবান্ স্বামী যে অরুণাকে ভুলিয়া গিয়া অপর দার-পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে অরুণার প্রাপ্য আদর-সোহাগের ও সংসার-সুখের অংশীদার করিয়া দিতে গৃহে আনিবে—ভাগ্যদেবতার এরূপ নিষ্ঠুর ছলনা কয়জন নারীকে সহিতে হইয়াছে? অরুণা যে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে তজ্জন্য তাহার শুভাদৃষ্টে ঈর্ষ্যান্বিত না হইয়া তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত। জ্যোৎস্না, বয়সের অভিজ্ঞতা পাইয়া,

জানিয়া শুনিয়া, ভাবী অশুভ সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য করিয়া, যে অদৃষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার ফলের জন্য এখন অধীর হইলে, তাহার নিজেরই শিক্ষার ও জ্ঞান-বুদ্ধির নিন্দার কথা। অরুণা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া আশৈশব জীবন কাটাইয়াছে, উচ্চশিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে লোক-সমাজে বিচরণ করিয়া মনের ঔদার্য্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ তাহার হয় নাই। সুতরাং যে স্বামীকে সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানবুদ্ধি-বিকাশের স্তরে স্তরে, বাল্যকৈশোর-যৌবনাবর্ত্তের পাকে পাকে, আপনার নারী-হৃদয়ের ভালবাসার সাথী করিয়া, প্রাণে গাঁথিয়া লইয়াছে, বিধি-বিড়ম্বনায় সেই স্বামীকে তাহার হৃদয় হইতে অন্য কেহ সবলে ছিনাইয়া লইতে আসিলে সেই অতর্কিত যাতনা সে কি করিয়া সহ্য করিবে?

জ্যোৎস্নার পদতল হইতে যখন ধরিত্রীর সরিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে জ্যোৎস্না যেন একটু ক্ষীণ আশার আলোক দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, হয়ত অজয় তাহার তরুণ বয়সে বিবাহিত—মাতাপিতার নির্ব্বাচিত—পত্নীকে সাধারণ লোকের মত সংসারযাত্রার সহায় ভাবিয়া মায়া মমতা করে—প্রণয়ীর আবেগে ভালবাসে না, এবং বহুদিন অদর্শনে সেই পত্নী-স্নেহও অজয়ের মনে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন সেই দিন সন্ধ্যাকালে অজয় আসিয়া জ্যোৎস্নাকে সংবাদ দিল, "সে

এল না” তখন অজয়ের স্বরের সুরে, মুখের ভঙ্গীতে, চক্ষের ইঙ্গিতে জ্যোৎস্নার মনের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল—অজয়ের হৃদয়ে অরুণার প্রতি ভালবাসা কিরূপ গভীরভাবে আধিপত্য করিতেছে। জ্যোৎস্না যে গত কয়দিন অজয়ের ব্যবহারে অরুণার প্রতি সেই গভীর ভালবাসার লক্ষণ দেখিতে পায় নাই, সেজন্য তাহার মন বাহিরে সুখী হইলেও অন্তরে ব্যথা পাইতেছিল—তাহার প্রণয়দেবতাকে হৃদয়হীন ভাবিয়া জ্যোৎস্নার হৃদয় তাহাকে যাতনা দিতেছিল—অজয়ের উপর শ্রদ্ধায় একটা আঘাত লাগিতেছিল। অজয় যখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অরুণার না আসিবার কারণে তাহার অন্তরের বেদনার পরিচয় দিল, তখন জ্যোৎস্নার মন হইতে যেন সত্য সত্যই একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

পরদিন প্রাতে অজয় তাহার মাতার কাছে যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে ধরণীবাবুর বাসাবাটীর দ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না উপরের জানালা হইতে দেখিল হেমাঙ্গিনী গাড়ী হইতে নামিতেছে। জ্যোৎস্না দ্রুতপদে নিম্নতলে আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে তাহার নিজের কক্ষে লইয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী কোনরূপ গৌরচন্দ্রিকা না করিয়াই বলিল, ‘ চল বৌদি’ এইবার আমাদের বাড়ীতে চল। শুনেছ ত? মা

তাঁকে কাশী থেকে আন্‌তে পাঠিয়ে ছিলেন, তা ঠাকরুণ গুমোর করে এলেন না। বয়েই গেল! কেন— দাদা কি তাঁর একলার ইজেরা করা নাকি? বাপ ত রুলী হাতে দিয়ে পার করেছিল —বড় কপাল জোর তাই আমাদের মত ঘরে পড়েছিল। দাদার যে অবস্থা, তা'তে দশটা বিয়ে কর্‌লেও রাজার হালে চলে যা'বে। দাদা আর একটা বিয়ে করেছে তা আর সহ্য হলো না। তা তিনি না এলেন না এলেন—তুমি ত আজ চল। বলে—'সাধ্‌লে জামাই খান না—না সাধ্‌লে পান না'—এর পর সেধে আস্‌তে হবে! তখন তেমন তেমন দেখ— না হয় আলাদা করে দেবো। চল ভাই—আজ চল।"

জ্যোৎস্নাকে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ দেখিয়া হেমাঙ্গিনী মনে করিল—বুঝিবা সপত্নীর সহিত বিবাদ করিয়া বসবাস করিবার প্রস্তাবটা জ্যোৎস্নার পছন্দ হইতেছে না, তাই সে জ্যোৎস্নার মনস্তুষ্টির জন্য হাসিয়া কহিল, "দাদা আর সে মোমের পুতুল—মাকাল ফলের দিকে ঝুঁক্‌ছে না—রংটা কটা হলে কি হবে—তোমার মুখ-চোক—তা'ছাড়া গড়নের চটক্ কেমন? তুমি ত আর তাঁর মতন হা-ঘরের মেয়ে নও যে তাঁর হাত তোলা খেয়ে থাক্‌তে যা'বে? তুমি আগে গিয়ে সংসার দখল করে বস—তা'হলেই দেখ্‌বে সে আপনি এসে জুঠ্‌তে পথ পাবে না। মা যে আজ কাল তাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে—

নইলে আজ যদি খরচ পাঠান বন্ধ হয়, তা হ'লে কাল তা'কে আসতে হয় কি না দেখি।"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়, প্রথমে ঘৃণায় শেষে আতঙ্কে, পরিণত হইয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর শেষের কথাটা শুনিয়া জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী মনে করিল বুঝি অরুণার গৃহে আসা জ্যোৎস্নার আন্তরিক ইচ্ছা নহে—সেইজন্য অরুণাকে শীঘ্র আনাইবার কথায় জ্যোৎস্না ভীত হইয়াছে। তাই হেমাঙ্গিনী জ্যোৎস্নাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, "তা এখন ত আর কেউ তা'কে আন্‌তে যাচ্ছে না। যখন নিজে আস্‌বে, তোমার মন যুগিয়ে থাকে, ভাল, না থাকে—রেষারিষি করে মাকে বলে না হয় দুজনের পালা করে দেওয়াব।"

জ্যোৎস্না ঘৃণায় ও লজ্জায় মনে করিল, মেদিনী যদি দ্বিভাগ হয়েন তাহা হইলে সে সেই গহ্বরে প্রবেশ করে। এই ননদের বাক্যবান সহ্য করিয়া অরুণা যে কি কষ্টে ছিল, তাহা কল্পনা করিয়া জ্যোৎস্নার হৃদয় অরুণার প্রতি করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে হেমাঙ্গিনীর বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "সে সব পরের কথা পরে হ'বে, এখন সে সব কথা তুল্‌ছ কেন? এখন ত আমি যাচ্ছি না! আমি এর পরে যাব—মাকে পিসিমাকে প্রণাম কর্‌তে ত যেতেই হবে। তা দিদি এলেই আমি যা'ব।"

হেমাঙ্গিনী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সে কি ভাই! তাঁর পায়া ভারি হয়েছে—তিনি যদি এখন না-ই আসেন?"

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে কহিল, "আসবেন্ বৈকি? আমি নিজেগিয়ে তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।"

হেমাঙ্গিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি গিয়ে নিয়ে আস্‌বে? ঠাট্টা কর্‌ছ না কি?"

জ্যোৎস্না অবিচলিতভাবে উত্তর দিল, "না—ঠাট্টা কেন—সত্যিই বলছি আমি কালই কাশীতে যা'ব ঠিক করেছি।"

হেমাঙ্গিনী অবাক্ হইয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল। সে জ্যোৎস্নাকে বুঝিতেই পারিল না। বড় লোকের ঘরের মেয়ের একে ত একটা সতীন জুটিয়া গেল—তারপর নিজেই সেই সতীনকে ঘরে আনিতে যাইবে বলিতেছে—উন্মাদ না কি? হেমাঙ্গিনী মনের বিরক্তি গোপন রাখিতে না পারিয়া কহিল, "আচ্ছা সে যা ভাল বোঝ তা কোরো—আমার কাজ ত আমি করে গেলুম? তারপর তোমার ইচ্ছে। তা হ'লে আমার সঙ্গে ত এখন যাবে না? আমি আসি তবে।" এই কথা বলিয়া হেমাঙ্গিনী জ্যোৎস্নার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বিদায় লইল।

হেমাঙ্গিনী প্রস্থান করিতেই জ্যোৎস্না পিতার কাছে গিয়া তাহার মনের ইচ্ছা অকপটে জ্ঞাপন করিল এবং

পরদিন তাহাকে কাশীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিল। ধরণীবাবু জ্যোৎস্নার প্রস্তাব, যুক্তিযুক্ত কি না তাহা বিচার না করিয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত তাহার ইচ্ছা পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

সন্ধ্যার পরে অজয় আসিলে জ্যোৎস্না বলিল, "কাল তোমাকে আমার সঙ্গে কাশীতে যেতে হ'বে।"

অজয় বিশুষ্ক-মুখে ধীরে ধীরে কহিল, "হেমাকে তুমি যা বলেছ সব শুনেছি। বেশ করে ভেবে দেখেছ কি? যদি না আসে?"

জ্যোৎস্না সহাস্য-বদনে উত্তর দিল, "কেন? আমার মান-হানি হবে? ছোটর কথা বড় না রাখ্‌লে কি ছোটর অপমান হয় নাকি? তা ছাড়া তুমি যা ভয় কর্‌ছ তা হ'বে না—তিনি আস্‌বেনই—সে ভার আমার রইল।"

অজয় আর দ্বিরুক্তি করিল না। পরদিন মাতার ও পিতৃ-ষ্বসার কাছে সে কথা বলাতে, তাঁহারা অজয়কে পুনরায় দূরদেশে যাইতে দিতে প্রথমে আপত্তি করিলেন কিন্তু শেষে অজয়কে জ্যোৎস্নার সহিত যাইতে কৃতসংকল্প দেখিয়া সম্মতি দিলেন।

রামহরি, পতিতপাবন ও ধরণীবাবুর বিশ্বস্ত দ্বারবানকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই পাঞ্জাব মেলে অজয় ও জ্যোৎস্না কাশীতে যাত্রা করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্ন কালে অরুণা বারাণসীতে তাহাদের বাসা-বাটীর দ্বিতলের কক্ষে একাকিনী জানালার ধারে বসিয়া তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। সমস্তদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছিল—আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন—বেলা পাঁচটার সময়ই বোধ হইতেছিল যেন সন্ধ্যার তামসী ছায়া বারাণসীর পথঘাট ছাইয়া ফেলিয়াছে। অরুণা জানালার ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছে—পর-পারে—দিগন্ত-সীমায়—কাশীনরেশের প্রাসাদের অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে—গঙ্গাবক্ষে তরণীর যাতায়াত নাই—দূরে ব্যাসকাশীতে রাজোত্থানের দেব-মন্দিরের চূড়ার ক্ষীণাভাসও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অরুণার দৃষ্টি যেন সেই কুজ্ঝটিকাবৎ বারিবর্ষণের যবনিকা ভেদ করিয়া সেই মন্দির-চূড়ার অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য একাগ্র হইয়া সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। অথচ অরুণার দৃষ্টি অন্তর্মুখ—বাহিরের বস্তু সে কিছুই দেখিতেছে না। সে তখন একাগ্রমনে ব্যথিত ও উৎকন্ঠিতচিত্তে সুদূর কলিকাতায় তাহার গৃহের কথা ভাবিতেছে—সনৎ তখন কি করিতেছে—শাশুড়ী ও পিসিমাই বা কি করিতেছেন—অজয়ই বা তখন কি অবস্থায়? সে কি নববধূকে বাড়ীতে লইয়া

গিয়াছে? অজয় কি তাহার কথা ভাবে? সে যে যায় নাই তাহাতে অজয় কি দুঃখ করিয়াছে—না সন্তুষ্ট হইয়াছে? তাহার সুখের কণ্টক দূরে থাকিলেই ত তাহার পক্ষে ভাল—সে নির্ঝঞ্ঝাটে তাহার নবপরিণীতাকে লইয়া ঘর করিতে পারে। এখন আর অজয় তাহার কথা ভাবিবে কেন? নূতনে রুচি পুরাতনে অরুচি—ইহা ত চিরন্তন প্রথা—চোখের আড়াল হইলে মনেব বাহির ত হইয়াই থাকে। অজয়ের সোহাগ-আদর-স্নেহ-যত্নের কত পুরাতন কথা, স্তব্ধ-নিশীথে দূরাগত মধুর মুরলীধ্বনির মত, তাহার মনে আসিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। সেই ক্ষণিক সুখস্বপ্ন ভঙ্গে, মর্ম্মবেদনায় কাতর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বত-উত্থিত একটী দীর্ঘশ্বাস যেন তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইল—তাহার নয়নযুগল বাষ্প-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। সে বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল এমন সময় কে একজন কোমল ও করুণার্দ্রস্বরে তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "দিদি।"

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অদূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইয়াছিল ও তৎপরে তাহাদের বাটীর নিম্নতলে কাহারা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল—কিন্তু অরুণা নিজের চিন্তায় এরূপ ব্যাপৃত ছিল, যে সে শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই। অকস্মাৎ নিকটেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখে একজন নারী দাঁড়াইয়া আছে।

অরুণা ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক পুনরায় বলিল, "দিদি, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌ছ না?—আমি তোমার নতুন বোন—জ্যোৎস্না।"

অরুণা বিমূঢ়ার মত জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া গৃহের সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেই চিনিল—গণকের বাটীতে অজয়ের সহিত যে নারীকে দেখিয়াছিল সেই মূর্ত্তিই বটে।

অরুণা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি! তুমি এখানে?"

জ্যোৎস্না কহিল, "বল্‌ছি, আলোটা জ্বালো না?"

অরুণা উঠিয়া দীপ জ্বালিতেই জ্যোৎস্না তাহার নিকটে গৃহতলে বসিয়া কহিল, "তোমাকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি দিদি।"

অরুণা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে নিতে এসেছ? কেন?"

জ্যোৎস্না কহিল, "কেন কি দিদি? তুমি ঘরের বৌ—বিদেশে পড়ে থাক্‌বে? কতদিন পরে, এক রকম মরে বেঁচে উঠে বিদেশ থেকে স্বামী ঘরে এলেন—তুমি কোথায় তাঁকে আদর যত্ন করে ঘরে তুলে নেবে—না এখানে বসে থাক্‌বে?"

অরুণা জ্যোৎস্নার মনেরভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "তুমি ত সঙ্গে আছ—আমাকে দরকার কি?"

জ্যোৎস্না সহজভাবে কহিল, "আমি কে দিদি? তোমার জিনিস হারিয়ে গিয়েছিল, আমি পথে কুড়িয়ে পেয়ে, তোমার

সন্ধান পাইনি, তাই ফিরিয়ে দিতে পারিনি—যত্ন করে রেখে ছিলুম। তোমার সন্ধান যদি পাওয়া যেত, তাহলে উনিই কি তোমাকে ছেড়ে থাকৃতেন—না আমিই রাখ্‌তে পারতুম? ভুল বুঝো না দিদি—লক্ষ্মীটী—ঘরে চল। তুমি যাওনি তা'তে ওঁর মনে যে কত কষ্ট হয়েছে তা দেখ্‌লে তুমি একদণ্ডও এখানে থাকৃতে পারতে না।”

অরুণা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই কি সতীন! এ কি মর্ম্মান্তিক দুঃখের সময় তাহার সঙ্গে রহস্য করিতে আসিয়াছে, না অরুণাই ভুল বুঝিয়াছে? উজ্জল দীপালোকে অরুণা দেখিল জ্যোৎস্নার আননে সারল্য ও নয়নে কারুণ্য জাজ্বল্যমান। জ্যোৎস্না অরুণার মুখেব সন্দিগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, “একটা কথা আগে তোমাকে বলে দিই দিদি—তুমি ভেবোনা যে, উনি যে ঘর বাড়ী—তোমাদের সব একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন, সেটা মিথ্যে কথা। উনি যে প্রাণে বেঁচে উঠেছিলেন, তাই দেখেই ডাক্তারেরা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল—তখন ওঁর কোন কথাই মনে ছিল না—ওঁর সে অবস্থা দেখ্‌লে ওঁব ওপর মান অভিমান করেছ—তাই ভেবে নিজেই লজ্জা পেতে। তোমাদের কথা মনে থাকৃলে উনি কি তোমাদের কাছে খবব না পাঠিয়ে থাকৃবার লোক? এটা আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা। আমি ত বছর দেড়েক ওঁকে দেখ্‌ছি বইত নয়? তার আবার প্রথম ক'মাস ওঁব ছোট ছেলেব মতনই কেটে

গিয়েছিল। তা না হলে, উনি কি তোমাকে ভুলে থাকবার মতন স্বামী—না যা'কে লোকে ভুলে' থাক্‌তে পারে, তুমি ওঁর সে রকম স্ত্রী? ওসব মিছে সন্দেহ কোরোনা দিদি—তোমার ওপর টান ঠিক আগেকার মতনই আছে। গ্রহের ফেরে তোমার কাছে একটা অপরাধ করে ফেলেছেন—সেই লজ্জায় তোমার কাছে আস্‌তে পারেন নি। আর তাঁকে কষ্ট দিও না দিদি—চল ঘরে চল।"

অরুণাকে নিরুত্তর দেখিয়া জ্যোৎস্না পুনরায় কহিল, "তাঁকে ডেকে দেবো? তোমার বাবার সঙ্গে নিচে কথা কচ্ছেন—লজ্জায় আস্‌তে পার্‌ছেন না।"

অরুণা জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "না না—তাঁকে আন্‌তে হবে না।"

জ্যোৎস্না কহিল, "তবে ভাব্‌ছ কি?"

অরুণা ভাবিতেছিল জ্যোৎস্না কেন তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে আসিল? স্ত্রীর অধিকারে কে কোথায় নিজের ইচ্ছায় বঞ্চিত হইতে চাহে? স্বামীর ভালবাসাকে কি জ্যোৎস্না এতই অবহেলার বস্তু বিবেচনা করে যে হেলায় তাহা বিলাইয়া দিতে আসিয়াছে? না স্বামীর ভালবাসার উপর সে এতই অভ্রান্ত বিশ্বাসী যে অপর কেহ সে ভালবাসার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিবে না জানিয়াই সে লোকলজ্জায় পড়িয়া অরুণাকে লইতে আসিয়াছে? কিন্তু তাহা হইলে

জ্যোৎস্নার মুখে ও কথায় এতটা করুণা ও সহানুভূতি জাগিয়া উঠিত না। তবে কি অরুণা কলিকাতায় না যাওয়ায় অজয় যথার্থই কাতর হইয়াছিল এবং অজয়ের দুঃখে ব্যথিত হইয়া জ্যোৎস্না তাহাকে লইতে আসিয়াছে? তাহা না হইলে জ্যোৎস্না ত তাহাকে চিনিত না—সে তাহার মনোদুঃখ বুঝিল কি করিয়া? তবে কি সপত্নী বিদ্বেষটা কথার কথা? না জ্যোৎস্নারই হৃদয়ে তাহা স্পর্শ করে নাই? অরুণার নিজেরও ত জ্যোৎস্নার উপর কোনও বিদ্বেষ নাই—স্বামীর উপর অভিমান করিয়াই সে কলিকাতায় যায় নাই, জ্যোৎস্নাব সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যার জন্য নহে। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অরুণাকে চিন্তিত দেখিয়া জ্যোৎস্না পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ভাব্‌ছ কি, দিদি?"

অরুণা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমারই কথা ভাবছি বোন্। তুমি যে আমাকে কেন নিতে এলে তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তোমার সবে বিয়ে হয়েছে—কোন সাধই পোরেনি—তবে তুমি গোড়া থেকেই নিজের সুখের ভাগ দিতে এসেছ কেন? তোমার যে বুদ্ধি নেই—তা বলেও ত বোধ হয় না।"

জ্যোৎস্না বিশুষ্ক মুখে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ভাগ কিসের দিদি! তোমারই ত সব। আমাকে কি স্বামীর ঘর কর্‌বার মত ছোট বৌটী বলে তোমার বোধ হচ্ছে? আমি যে বিয়ে

করে স্বামীর ঘর কর্‌ব এ সাধ ত আমার মনেই উঠ্‌ত না। সে সাধ যদি থাকৃত—তা হলে হিঁদুর ঘরে জন্মে কি এতদিন আইবুড় থাকতুম? তুমি যে ভাবে স্বামীর ঘর করেছ শুনেছি, তা তোমার মত কুললক্ষ্মীরাই পারে—আমি তা পার্‌তুম না। বাপের ঘরে চিরকাল থাক্‌ব জেনেই বিয়ে করেছিলুম—নইলে আমার আইবুড় নামটা ঘোচাবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না—তা ঠিক জেনো। এখন তোমার অভিমানে স্বামীর দুঃখ দেখেই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি তাঁর ওপর অভিমান কর্‌তে পার, সে জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—কিন্তু আমার তাঁর ওপর অভিমান কর্‌বার কোনও কারণ নেই। তোমার মত স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন না একথা জান্‌লে বরং তেমন পুরুষের গলায় মালা দিয়েছি ভেবে লজ্জায় আমি মরমে মরে যেতুম। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘরে চল দিদি। আমার জন্যে তুমি যে ঘর ছেড়ে আছ এইটে শুনে আমি যে কি লজ্জায় আছি তা আর তোমাকে কি বোঝাব। এখন আমার কথাটা রাখ—স্বামীকে সুখী কর—তাহ'লে আমিও সেই লজ্জা থেকে মুক্তি পাই।”

অরুণাকে মৌন দেখিয়া তাহার সম্মতি অনুমান করিয়া লইয়া জ্যোৎস্না কহিল, “তাহ'লে আজই যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে বলিগে।”

সেই কথামত সেই রাত্রের গাড়ীতেই সকলে কলিকাতায় আসিবার জন্য কাশী ত্যাগ করিল।

রেলের গাড়ীতে একপ্রান্তে বসিয়া জ্যোৎস্না তাহার জীবনের অতীত কাহিনী সমস্তই অকপটে অরুণার নিকট ব্যক্ত করিল। কাশীতে গণকের বাটীতে, গণকের চেলার ব্যবহার দেখিয়াই জ্যোৎস্না ও অজয় হাসিয়াছিল—তাহাকে দেখিয়া হাসে নাই—কিন্তু অরুণা ভুল বুঝিয়াছিল দেখিয়া জ্যোৎস্নার মনে যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। জ্যোৎস্নার মুখে সেই কথা শুনিয়া অরুণা মৃদুস্বরে কহিল, 'হাঁ—ভুলই বুঝেছিলুম বটে।"

জ্যোৎস্না ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আমাকেও যে তুমি কি ভেবেছিলে তা-ও বুঝ্‌তে পার্‌ছি!"

অরুণা ব্রীড়াবনত-বদনে উত্তর দিল, "আর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই।"

গাড়ীতে বসিয়া এইরূপ সহজ কথোপকথনে জ্যোৎস্না বুঝিতে পারিল যে তাহার উপর সন্দেহের ভাবটা অরুণার মন হইতে কাটিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না প্রীত হইল।

হাবড়ার ষ্টেশনে ধরণীবাবুও গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন এবং অজয়ের বাটী হইতেও গাড়ী গিয়াছিল। সকলে মিলিয়া প্রথমে অজয়ের বাটীতে আসিয়াই উঠিল। দ্বারে গাড়ী লাগিতেই দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাদের নিকটে আসিল। সনৎ আসিয়া মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল—অরুণা উচ্ছ্বসিত

আবেগে পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, পরে জ্যোৎস্নাকে দেখাইয়া পুত্রকে বলিল, "ছোটমাকে প্রণাম কর।"

জ্যোৎস্না তাহার পদপ্রান্তে প্রণত সনৎকে "থাক্ থাক্" বলিয়া ব্যগ্রভাবে উঠাইয়া চিবুক ধরিয়া তাহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিল, "লক্ষ্মী ছেলে।"

সকলে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেই হৈমবতী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অরুণা ও জ্যোৎস্না পরে পরে উভয়েই তাঁহাদের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। অরুণার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। হৈমবতী উভয়কেই "জন্মএস্ত্রী হও—সুখে থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করিয়া "এস মা—সব ঘরে এস" বলিয়া অগ্রগামী হইয়া তাহাদের বাটীর মধ্যে লইয়া যাইলেন।

অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিবার দুইদিকে দুইটী সিঁড়ি। হেমাঙ্গিনী জ্যোৎস্নার হাত ধরিয়া "এস ছোট 'বৌ-দি' এদিকে এস" বলিয়া জ্যোৎস্নাকে সম্মুখের পথ হইতে অন্য দিকের সিঁড়ির কাছে লইয়া যাইল। ইত্যবসরে অপর সকলে বিষ্ণুপ্রিয়ার পশ্চাতে হৈমবতীর সহিত সম্মুখের সোপান দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী জোৎস্নাকে কহিল, "এস ভাই, এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চল। তোমার জন্যে আমি মার ঘরটা সাজিয়ে রেখেছি।

সেইটাই আমাদের বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভাল ঘর। মা আর একটা ঘরে থাক্‌বেন বলেছেন।"

জ্যোৎস্না বলিল, "আমাকে যে এখন বাড়ী যেতে হবে ভাই। বাবা ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—সেই গাড়ী দরজায় হাজির রয়েছে। এখানে আস্‌ব—বাবাকে ত বলে আসিনি—তা হ'লে কি এমন করে এক কাপড়ে আস্‌তে দিতেন? আমি ত এখন থাক্‌ব বলে আসিনি—আমাকে বাড়ীতে যেতেই হবে—বাবা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "তা কি হয়! আমি সে কথা শুন্‌ছি না—মার কাছে চল।"

জ্যোৎস্না শঙ্কিতভাবে কহিল, "না ভাই—মাকে পিসিমাকে তুমিই বুঝিয়ে বোলো—লক্ষ্মীটী—কিছু মনে কোরো না—আমি আসি।" এই কথা বলিয়া হেমাঙ্গিনীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জ্যোৎস্না বহির্বাটী দিয়া তাহার পিতার প্রেরিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই তখন অজয় ও অরুণার সঙ্গে উপরে গিয়াছিল—কেহই জ্যোৎস্নার বিদায় গ্রহণ লক্ষ্য করিল না। হেমাঙ্গিনী জ্যোৎস্নার ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—প্রতিবাদ করিতে বা বাধা দিতে তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন জ্যোৎস্নার খোঁজ পড়িল তখন

তাহার বিদায় গ্রহণের কথা হেমাঙ্গিনী সকলকে জানাইয়া দিল; সকলেই সে কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। হৈমবতী ক্ষুব্ধ হইলেন; হেমাঙ্গিনী অনেকের মুখেই অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া তাহার নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল—সে বলিল, "যাই বল বাপু, বৌ-দি'কে এনে দিয়েই যা'ক আর যাই করুক, ভারি দেমাক,—যেন পুরুষ মানুষের মতন জবরদস্তি চালচলন—কথাবার্ত্তা।"

হৈমবতীর সেই অপ্রীতিকর মন্তব্য ভাল লাগিল না। অজয় তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছিল—সে কথা মনে পড়িল। তিনি হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, "একদণ্ড দেখেই লোককে ভালমন্দ বলিস্ নি। ভাল কি মন্দ, তা জান্‌লি কি ক'রে? ওঁরা পশ্চিমে থাকেন—এখানকার ধরণ ধারণ সব ওঁদের জানা নেই।"

অজয় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে জ্যোৎস্নার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইবে কি, তাহাকে একটা যেন কি অনিশ্চিত শঙ্কট হইতে জ্যোৎস্না অন্ততঃ সে দিনের জন্য নিষ্কৃতি দিয়া গেল বলিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিবে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। অজয়ের মন তৎকালে 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' এই দুরূহ সমস্যা অচিরে মীমাংসা করিবার জন্য তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল। জ্যোৎস্না পিতার বাসায় যাওয়াতে অজয় সেই সমস্যা সমাধানের জন্য একটু অতিরিক্ত সময় পাইয়া মনের নিভৃত কোণে

যেন কিছু সন্তোষ লাভ করিল। অবশ্য তাহার বাহ্যিক ভাবে তাহা প্রকাশ পাইল না—কারণ অজয় নিজেও সে কথা বোধ হয় সত্য বলিয়া আপনার কাছে স্বীকার করিত না।

সে দিন অরুণার আগমনে অজয়ের আত্মীয়-সমাজে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দ যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সে দিন আর জ্যোৎস্নাকে আনিবার কথা, অরুণার মুখ চাহিয়া, হৈমবতী বা অপর কেহই উত্থাপন করিলেন না। অজয়ও সে দিন আর অন্যদিনের মত জ্যোৎস্নার সহিত অপরাহ্নে দেখা করিতে যাইতে সাহসী হইল না। সে মনকে বুঝাইল জ্যোৎস্নার ব্যবহারে তাহার অভিমান হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্না বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ধরণীবাবু তাঁহার শয়ন-কক্ষে বিমর্ষ-বদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া জ্যোৎস্না নিজের কথা ভুলিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, অমন করে বসে রয়েছেন কেন? কিছু অসুখ করে নি ত?"

ধরণীবাবু কহিলেন, "না মা, তুমি যা বলে গিয়েছিলে, সেই রকম বন্দোবস্ত করে এসে—তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। আজই কি যাওয়া ঠিক কর্‌লে?"

জ্যোৎস্নার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল, সে ধীরে ধীরে কহিল, "হাঁ বাবা আজই যেতে হ'বে।"

ধরণীবাবু কহিলেন, "ভাল করে ভেবে দেখেছ কি? এখানে থাক্‌লে হয় না? না হয় আলাদা বাড়ী করে দেব—আমার কাছে থাক্‌বে।"

জ্যোৎস্নার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া যাইল, সে উত্তর দিল, "না বাবা—ঢের ভেবে দেখেছি—এখানে থাকা হ'তে পারে না।"

ধরণীবাবুর মুখে মর্ম্মকাতরতার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া জ্যোৎস্না

কষ্ট-হাসি হাসিয়া, বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব লঘু করিয়া দিবার জন্যই যেন কহিল, "পরের জিনিসে লোভ করে কি হবে বাবা ?"

ধরণী বাবু কহিল, "পরের জিনিস কেন বল্‌ছ মা ? তোমাকেও কি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেন নি ?"

জ্যোৎস্না পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "সেটা ভুল করে হয়ে গিয়েছিল বাবা—সে জন্য তাঁকে দুনৌকয় পা দিয়ে থাকবার শাস্তি ভোগ করানটা কি ভাল হবে ? আর তিনি সে শাস্তি মাথায় পেতে নিলেও, আমার সে অবস্থাটা যে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না বাবা। যে জন্যে বিয়ে কর্‌তেই চাইনি—এতে যে তার চেয়েও হীনতা স্বীকার করা হ'বে বাবা ? নিজের সুখের জন্যে—ভালবাসার খাতিরে—নারী জাতকে পুরুষের কাছে অতটা খাটো কর্‌তে বল্‌বেন না—তার চেয়ে যে আমার মরণই ভাল।"

ধরণীবাবু সে কথায় প্রথমে উত্তর দিলেন না—পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার তখনকার অবস্থায় আর এখনকার অবস্থায় ঢের তফাৎ হয়ে গেছে যে মা ? এখন কি আর আগেকার মত বুড়ো বাপকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে ? তোমার ভাবনাতেই আমি যে কূল কিনারা দেখ্‌ছি না মা !"

জ্যোৎস্না পিতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, "আপনি আমার জন্যে কিছু ভাব্‌বেন না বাবা—আমি এখানকার চেয়ে, দূরে গিয়ে আপনার কাছে ঢের ভাল থাক্‌ব—আপনার টাকা

আছে—যা'তে লোকের উপকার হয় এমন সব কাজে যা'তে সময়টা কাটাতে পারি তার চেষ্টা করব।"

ধরণীবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তাই হো'ক তবে মা—আজই যাবার বন্দোবস্ত করে আসিগে।"

ধরণীবাবু বাহিরে যাইতেই জ্যোৎস্না আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দ্বার ভিতরে হইতে বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে পিতার নিকট আপনার দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইবার ভয়ে প্রাণপণে আত্মদমন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে সে অবারিত অশ্রুধারায় শয্যা সিক্ত করিতে করিতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল। অজয় যে একদিন তাহাকে বলিয়াছিল যে সে তাহার প্রাণের প্রাণে জড়াইয়া গিয়াছে, সে কথা অজয়ের পক্ষে সত্য না হইলেও জ্যোৎস্নার নিজের পক্ষে যে কত সত্য তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। অজয়কে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণের বাঁধন যে ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, এ কথা সে কাহাকে জানাইবে? কে-ই বা তাহার সে বেদনা বুঝিবে? পিতাকে জানাইলে, তাঁহার মনের কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া তিনি অভিভূত হইবেন—তাহাতে জ্যোৎস্নার ক্লেশ দ্বিগুণিত হইবে মাত্র। আর অজয় ত একেই আপনাকে জ্যোৎস্নার কাছে অপরাধী ভাবিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করিতেছে—তাহার উপর সে যদি জ্যোৎস্নার মনের ব্যথার গভীরতা ঠিক বুঝিতে পারে তাহা হইলে, তাহার স্ত্রীপুত্র

আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলনের আনন্দ—দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাহাতে জ্যোৎস্নার ত মনঃকষ্ট বিন্দুমাত্রও কমিবে না—বরং অজয়ের পরিবারবর্গের সুখের হন্তারক হইয়া সে অধিকতর অসুখীই হইবে। সুতরাং অজয় যাহাতে তাহার মনোদুঃখের গভীরতা বুঝিতে না পারে তাহাই জ্যোৎস্নার কর্ত্তব্য উচিত! নিজের কষ্ট জানাইয়া আর পাঁচ জনকেও অসুখী করিয়া ফল কি? নাঃ—জ্যোৎস্না তাহার দুঃখ জানাইয়া পরের নিকট মনের দৈন্য প্রকাশ করিবে না। নিজের দুঃখ পরকে জানাইয়া পরের সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়া জ্যোৎস্নার লাভ কি? অজয় যে তাহাকে পত্নীভাবে ভালবাসিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতেছে মনে করিবে, অরুণা যে তাহার স্বামীর স্নেহের অংশভাগী হইতে দিয়া জ্যোৎস্নাকে কৃপার চক্ষে দেখিবে, এরূপ হীনতা সে কি প্রাণ থাকিতে স্বীকার করিতে পারে? ববং সে যে অজয়ের স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া দিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত তাহার নবজীবনের মিলনানন্দ ষোল কলায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যাইতেছে—সে যে তাহার প্রিয়তমকে সুখী করিবার জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়াছে—এ চিন্তায় একটা সুখ আছে। সেই ত্যাগের স্মৃতি তাহার দুঃখময় ভবিষ্যৎ জীবনের দুর্ব্বহ ভার লঘু করিয়া রাখিবে। হয়ত অজয়ের আত্মীয় স্বজনগণ জ্যোৎস্নার ব্যবহারের নিন্দা করিবে—হয়ত কেহ বলিবে ধনীর কন্যা বলিয়া সে স্বামীর

ঘর করিল না—কেহ বা বলিবে অজয়ের উপর স্নেহ মমতা থাকিলে সে কখনও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না—হয়ত অজয় নিজেও জ্যোৎস্নার ভালবাসার গভীরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে। তাহা হউক, তাহার অন্তর্যামী ত জানিতেছেন স্বামীর সুখের জন্যই সে তাহার সহিত চির-বিরহের মর্ম্মান্তিক দুঃখ ইহজীবনের সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে, তখন অপরে কি ভাবিবে সে চিন্তায় তাহার প্রয়োজন কি? সে যে তাহার আত্মসম্মান—নারীর মর্য্যাদা—রক্ষার জন্য, স্বামীকে জীবনের কঠিন সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, আত্মসুখ বলি দিতেছে—সেই চিন্তা, যেন তাহাকে ভবিষ্যতের জীবন-ভার বহন করিবার সামর্থ্য দেয়—তাহার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের সুখের সম্বল হয়—ভগবান তাহাকে সেই আশীর্ব্বাদ করুন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্নার অবসন্ন দেহে যেন একটা নূতন শক্তি আসিল। সে উঠিয়া বসিয়া অজয়ের পুস্তক ও নিত্য ব্যবহারের দ্রব্য গুলি একটা বড় ট্রাঙ্কে পূরিল এবং আপনার দ্রব্য সামগ্রী গুছাইয়া লইল। শেষে তাহার বিবাহের সময় ধরণীবাবু যে সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার দিয়াছিলেন, একটা ক্যাস ব্যাক্সর মধ্যে সেগুলি পূরিয়া—সেই বাক্সটীও অজয়ের দ্রব্য-সামগ্রীর সহিত পূর্ব্বোক্ত ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখিয়া দিল।

জ্যোৎস্না পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহার কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা সে অজয়কে বলিবে না—বলিলে

অজয় নিশ্চয়ই বাধা দিবে—শেষে তাহার কাতর অনুরোধে হয়ত জ্যোৎস্নার মনের বল ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে স্থির করিল যে অজয় অপরাহ্ন কালে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সে যেমন করিয়া পারুক তাহার মনের সংকল্প গোপন রাখিবে। সে একখানি চিঠি লিখিয়া যাইবে—তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিলে সেই চিঠি ও ট্রাঙ্ক্‌টী অজয়ের বাটীতে পৌছিয়া দিয়া আসিবার বন্দো-ব্যস্ত করিয়া যাইবে।

জ্যোৎস্না অজয়কে পত্র লিখিতে বসিল কিন্তু সে পত্র লেখাও যেন সাক্ষাতে বিদায় লইবাব মতই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। দশ খানি পত্র সে লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—কোন খানিই তাহার মনঃপূত হইল না। কোনও খানিতে জ্যোৎ-স্নার মনের বেদনা শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—অজয়কে ত্যাগ করিয়া যাইতে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় তাহার হৃদয় যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল; কোনও খানিতে তাহার প্রাণের ভালবাসা, অজয় তাহাকে ভুলিয়া যাইলেও এ জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত, সমান আবেগে তাহার হৃদয়মন ভরিয়া রাখিবে—ইহা অজয়কে জানাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকট হইয়া উঠিল। কোনও খানিতে তাহার মনের অভিমান, অজয় তাহাকে যেন ভুলিয়া যায়, অজয় যেন তাহাকে ভুলিয়া সুখী হয়, এইরূপ শত ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল। জ্যোৎস্না সে সকল পত্র নয়নের জলে অভিষিক্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড

করিয়া ফেলিল। তাহার পত্র পাঠ করিয়া অজয় যাহাতে তাহাকে পুনর্লাভের জন্য ব্যাকুল না হয়, যাহাতে অজয় তাহার মনের ব্যথা জানিয়া নিজে ব্যথিত না হয়, সেইরূপ একখানি আবেগ-অনুরাগ-শূন্য পত্র লিখিবার জন্য মনকে কঠিন করিতে জ্যোৎস্না অশেষ যাতনা ভোগ করিল। শেষে বাষ্পাকুল-নয়নে কম্পিত-হস্তে কোনও রূপে সে একখানি লিপি শেষ করিল।

অপরাহ্নকালে ধরণীবাবু আসিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার এটর্নীর সহিত রেজিষ্টারী আপিসে গিয়া তাহার নূতন উইল এবং অন্যান্য দলিল ও দানপত্র রেজিষ্টারী করিয়া আসিয়াছেন। অজয়কে তিনি তাঁহার কারবারের কার্য্যাধ্যক্ষ ও তাহার অবর্ত্তমানে স্বত্বাধিকারী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন—এবং তাহার বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিবিধ লোকহিতকর দানে ও জ্যোৎস্নাকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। জ্যোৎস্না সে সকল বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না। তাহার মন তখন অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল।

ক্রমে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, জ্যোৎস্নার মন অজয়ের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল অজয়ের সহিত আর দেখা না হওয়াই ভাল—বিদায়ের কথা গোপন রাখিতে হয়ত তাহার ধৈর্য্য থাকিবে না। কিন্তু যতই বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন হইয়া আসিল ততই অজয়কে ক্ষণেকের তরেও একবার দেখিয়া

যাইবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন অজয় অন্যদিনের মত ধরণীবাবুর বাসায় আসিল না। জ্যোৎস্নার মনের সেই শেষ সাধ মনেই রহিয়া গেল।

রাত্রি ৮টার পর দ্বারে গাড়ী আসিল। ভারবাহীরা এবং ধরণী-বাবুর কর্ম্মচারিগণ আসিয়া দ্রব্য সামগ্রীর মোট, তোরঙ্গ, বাক্স গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। ধরণীবাবু আসিয়া বলিলেন, "অজয় কই আজ আর এলেন না—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হলেই ভাল হ'ত—তা আর হলো না—তাঁকে একখানা চিঠি লিখেই রেখে গেলুম। ঐ ট্রাঙ্ক্‌টায় তাঁর জিনিস গুলো আছে বুঝি? আর ঐ চিঠিখানা? দাও মা ও গুলো কাল সকালে তাঁকে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে যাই।"

ধরণীবাবু স্থির ভাবে ঐ কথা গুলি বলিলেন বটে, কিন্তু তিনিও অজয়ের নিকট কি বলিয়া বিদায় লইবেন সেই চিন্তায় ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অজয় না আসাতে তিনি যেন সেই দায় হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। জ্যোৎস্নার মনের তৎকালীন অবস্থা অনুমান করিয়া ধরণীবাবু নিজের বাহ্যিক স্থৈর্য্য বহুকষ্টে রক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু নিরুদ্ধ অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে ধরণীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডের যে অবস্থা, ধরণীধরেরও মনের তৎকালে সেই অসহনীয় অবস্থা।

ক্ষণকাল পরেই ধরণীবাবু কন্যাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। জ্যোৎস্না কোনও কথা কহিল না—আনত-

বদনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী যখন হাবড়ার সেতুর উপরে উঠিয়াছে—জ্যোৎস্না একবার মুখ তুলিয়া গ্যাসালোক-মালায় উজ্জ্বলিত রাজধানীর নৈশদৃশ্যের দিকে চাহিয়া তাহার জীবন-সর্ব্বস্বের উদ্দেশে বিদায় সম্ভাষণ করিল। তৎকালে হাবড়ার সেতুর উপর ঝটিকা বহিতেছিল—বায়ুর একটা প্রচণ্ড ঝাপট আসিয়া জ্যোৎস্নার মুখের উপর দিয়া যেন হাহা শব্দে কাঁদিয়া গেল। জ্যোৎস্না ক্রন্দনের অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস অতিকষ্টে সংবরণ করিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ-কমল গাড়ীর অন্ধকার কোণে লুকাইয়া বসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে অজয় তাহার স্বর্গীয় পিতার বসিবার ঘরে তাহার আইন-পুস্তকের আলমারীর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে এমন সময় সনৎ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আজ চা খাবেন না ?"

অজয় অন্যমনস্কভাবে প্রতি-প্রশ্ন করিল, "চা হয়েছে নাকি ?"

সনৎ উত্তর দিল, "হাঁ, মা তৈ'রী করে আন্‌ছেন।" এই কথা বলিয়া সে ছুটিয়া বাটীর অন্দরমহলের দিকে যাইল। অজয় যে কক্ষে বসিয়াছিল সেটী দ্বিতলের উপর, বহির্বাটী ও অন্দর-মহলের মধ্যস্থলে অবস্থিত—উভয়দিক হইতেই তাহাতে যাতায়াত করা যায়।

কলিকাতায় থাকিতে অজয় চা পান করিত না। প্রবাসে ধরণীবাবুর বাটীতে অবস্থান কালে তাহার চা পান করা অভ্যাস হইয়াছিল। বাটীতে ফিরিয়া সে 'নেশা' সে ভুলিতে পারে নাই—বাটীতে আসিবার পরদিন প্রাতেই সে 'চা'এর অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সংবাদ পাইয়া হৈমবতী তৎক্ষণাৎ চায়ের সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আনাইয়া পতিতপাবনকে দিয়া চা প্রস্তুত

করাইয়া পুত্রকে পান করাইয়াছিলেন। অরুণাকে সেই কথা বলাতে অরুণা সেইদিন স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিয়া সনৎকে দিয়া অজয়ের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পতিতপাবন একখানি জার্ম্মান্-সিল্ভারের ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া অজয়ের নিকটে রাখিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণা এবং সনৎও আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা অজয়কে এক পিয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া সনতের দিকে স্মিতাননে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারও চাই না কি ?"

সনৎ ব্রীড়াবনত মুখে মৃদুহাস্যে মৌন সম্মতি জানাইতেই অরুণা তাহাকেও এক পিয়ালা চা ঢালিয়া তাহাতে একটু অতিরিক্ত দুগ্ধ ও শর্করা মিশাইয়া পান করিতে দিল, এবং গৃহতলে বসিয়া প্রফুল্লবদনে উভয়ের চা পান দেখিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন বাটীতে আসিবার পর-মুহূর্ত্ত হইতেই অরুণার মান-অভিমান, দুঃখ-অসন্তোষ কিছুই ছিল না। সে স্বতঃসিদ্ধভাবে শ্বাশুড়ীর প্রদত্ত গৃহিনীপনা গ্রহণ করিয়া পতিপুত্র ও আত্মীয়স্বজনদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিয়াছিল—যেন অজয়ের নিরুদ্দেশ, প্রবাসে বিবাহ, অরুণার অভিমান করিয়া কাশীতে অবস্থিতি প্রভৃতি ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই। অজয় নিরুদ্দিষ্ট হইলে অরুণা তাহার নিত্যব্যবহার্য্য যে সমস্ত অলঙ্কার ও বসন-ভূষণ খুলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া একবার বলিতেই অরুণা সেগুলি

বাহির করিয়া পরিয়াছিল। একদিনেই সে যেন তাহার দেহের সেই পূর্ব্বলাবণ্য ও মনের স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতা কোনও মন্ত্রবলে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং আত্মীয়পরিজন সকলকেই তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ বিতরণ করিয়া সে নিজে সুখী এবং অপর সকলকেও সুখী করিতেছিল—এমন কি হেমাঙ্গিনীকেও সে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিয়া তুষ্ট করিয়াছিল।

সেইদিন অরুণা গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অবর্ণনীয় প্রীতির হিল্লোল আসিয়া অজয়ের বিশুষ্ক আনন প্রসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই অজয়ের আননের সেই ক্ষণপূর্ব্বের অবসাদ ফিরিয়া আসিল। অজয়ের যেমন মনে পড়িল যে জ্যোৎস্নাও নিত্যই তাহাকে এইরূপ যত্ন করিয়া চা পান করাইত—অমনি তাহার পূর্ব্ব-দিনের বিদায় গ্রহণের কথা এবং অজয়ও যে আর তাহার তত্ত্ব লয় নাই তাহা স্মরণে আসিয়া অজয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সেই চিন্তায় অজয় এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল যে তাহার হস্তস্থিত চায়ের পাত্র হইতে কিয়দংশ কবোষ্ণ চা তাহার পরিধেয়-বসন সিক্ত করিয়া গাত্রে পতিত হইল এবং সে শিহরিয়া উঠিল।

অরুণা তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "ওকি করলে—ফেলে দিলে! দাও আর খানিকটা ঢেলে দিই।"

চায়ের পিয়ালা পুনরায় পূর্ণ করিয়া অজয়ের হস্তে দিতে

গিয়া অরুণা অজয়ের মুখের গভীর বিষণ্নতা লক্ষ্য করিল এবং ধীরে ধীরে বলিল, "যা ভাব্‌ছ তা বুঝেছি—কাল একবার তা'র কাছে গেলে না কেন?"

অজয় অরুণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল সে মুখে কেবলই সহানুভূতি—অপ্রীতির লেশমাত্র নাই। অজয় আনতমুখে উত্তর দিল, "কাল আর যেতে পারলুম কই?"

জ্যোৎস্না বাড়ীতে আসিয়াই চলিয়া যাওয়াতে অরুণাও কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু জ্যোৎস্নার উপর সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয় নাই। সে নিজে যে জ্যোৎস্নাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিবার অবসর পায় নাই সে জন্য অরুণা নিজের উপরই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে জ্যোৎস্নাকে আনিতে পাঠাইবে স্থির করিয়াছিল এবং হেমাঙ্গিনীর অপ্রিয় মন্তব্যে কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু পূর্ব্বদিন স্বামীর সহিত মিলনের আনন্দ তাহার হৃদয়মনকে এরূপ ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার সেই বিশ্বনাথের নিকট বহুদিন প্রার্থিত অমূল্য দিনটিতে অন্য কোনও চিন্তায় কালহরণ করিবার তাহার প্রবৃত্তিও হয় নাই—শক্তিও ছিল না। এক্ষণে সেই আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জিত হইয়া, সেই দোষটী অজয়ের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই যেন, অরুণা অনুযোগের স্বরে অজয়কে কহিল, "কালকে তোমার একবার না যাওয়া ভাল হয় নি—আজ গিয়ে তা'কে নিয়ে এস।"

অজয় অধোবদনে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কহিল, "আমি তা'কে এখানে এসে থাক্‌বার কথা বল্‌তে পার্‌ব না।"

অজয়ের উত্তর শুনিয়া অরুণা বুঝিতে পারিল, যে জ্যোৎস্নার সহিত অজয় যে পূর্ব্বদিন সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই, তাহা বিস্মৃতি-বশতঃ বা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিবার জন্য নহে—তাহার অন্য কারণ আছে। হয়ত অরুণার অসন্তোষের ভয়েই যায় নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই ততক্ষণ অরুণার মনে সন্দেহ ছিল, হয়ত জ্যোৎস্নাকে পাইয়া অজয় তাহার প্রতি ভালবাসা ভুলিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সে বুঝিয়াছে অজয়ের উপর তাহার ভালবাসার প্রভাব অক্ষুণ্ন আছে—অজয় সেই অরুণা-অন্তপ্রাণ অজয়ই আছে। সুতরাং জ্যোৎস্নাকে তাহার স্বামীর স্নেহের অংশভাগিনী করিতে অরুণার মনে যে দ্বিধা ছিল নিজের পতিসোহাগ-সৌভাগ্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে তাহার সে দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছিল। প্রকৃতিগত সহৃদয়তা এবং কৃতজ্ঞতাও অরুণাকে জ্যোৎস্নার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল! অরুণা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "সে আবার কি কথা? আচ্ছা—তুমি না যাও আমি সনৎকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সনৎ যাও ত বাবা—গাড়ী তৈরী কর্‌তে ব'লে এস ত? তুমিই গিয়ে তোমার ছোটমাকে নিয়ে এস। বল্‌বে—আমি নিতে পাঠিয়েছি—আস্‌তেই হ'বে; তাহলেই তিনি আস্‌বেন এখন।"

অজয় দেখিল অরুণা ভুল বুঝিয়াছে। অজয় যে কি বিষম

সমস্যায় পড়িয়াছে তাহা অরুণার ধারণায় আসে নাই। সেই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই বলিয়াই সে লজ্জায় জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিতে যাইতে পারে নাই। এক্ষণে অরুণা সেই সমস্যা মীমাংসার দায়িত্ব হইতে তাহাকে কিয়ৎকালের জন্য অব্যাহতি দিতেছে দেখিয়া অজয় যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সনৎ মাতার আদেশ পালন করিতে তৎপর হইয়া গাড়ী প্রস্তুত করিবার সংবাদ পাঠাইতে বাহিরে যাইল। অজয় স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইত্যবসরে সনৎ দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "বাবা, কলুটোলা থেকে একটা বড় ট্রাঙ্ক্ আর চিঠি নিয়ে এসেছে।"

অজয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা নিয়ে আস্‌তে বল।"

অরুণা বাটীর ভিতরের দিকের দ্বার দিয়া অন্তরালে যাইতেই, একজন ভারবাহীকে সঙ্গে লইয়া ধরণীবাবুর আপিসের দ্বারবান জ্যোৎস্নার প্রেরিত ট্রাঙ্ক্‌টী অজয়ের কাছে নামাইয়া এবং চিঠিখানি অজয়ের হস্তে দিয়া, অভিবাদন করিয়া, বাহিরে যাইল।

পত্রের আবরণ ছিন্ন করিতেই তাহার মধ্য হইতে দুইখানি পত্র বাহির হইল; একখানি খোলা—ধরণীবাবুর লেখা, তাহাতে পূর্ব্বদিনের তারিখ, অপর খানি খামে বন্ধ—শিরোনামায় জ্যোৎস্নার হস্তাক্ষর। প্রথম পত্রে লেখা ছিল—

"শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

কলিকাতা।
৯ই ভাদ্র, ১২৯৮।

"কল্যাণবরেষু—.

আমরা আজ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইতে পারিলাম না, সে জন্য দুঃখ করিও না। কেন পারিলাম না তাহা জ্যোৎস্নার পত্রে জানিতে পারিবে। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি—আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমার এ কাজের বিচার করিও। আপিসে যাইলে অপর সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবে। আমি যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি তাহা পালন করিলে সুখী হইব—সে বিষয়ে তুমি কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ করিও না। তোমার উপর আমার স্নেহ-ভালবাসার একতিলও ব্যতিক্রম হয় নাই জানিবে। তোমার কোনও অপরাধ নাই—সকলই বিধাতার খেলা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীধরণীধর বসু।

পত্রখানি পাঠ করিয়া অজয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। ধরণীবাবুর আপিসের দ্বারবান আসিতে অজয় উঠিয়া গিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে সে স্খলিত-পদ-বিক্ষেপে আসিয়া নিকটস্থ শয্যার উপর বসিয়া পড়িল এবং কম্পিত-হস্তে অপর পত্রখানির আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহা পাঠ করিল। তাহাতে লিখিত ছিল—

"প্রিয়তম,

এই চিঠি যখন তোমার কাছে পৌঁছিবে তখন আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়্‌ব। তোমাকে ব'লে আসতে পারিনি সেজন্যে ক্ষমা কোরো। আমার মন যে এত কঠিন তবু তোমার কাছে বিদায় নিয়ে আসি সে শক্তি আমার নেই। তোমার মনে কত ব্যথা দিলুম তা বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু সময়ের গতিতে তুমি বুঝতে পার্‌বে আমি যে পথ নিয়েছি তা তোমার ভালর জন্যেই নিয়েছি। তোমার উপর আমার রাগ অভিমান কিছুই নেই—তোমার কোন দোষই নেই। তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লেই আমার ভাল ছিল, একথা প্রাণ থাকৃতে আমি কখনো বল্‌ব না। মনে পড়ে তোমার সঙ্গে আমার, টেনিসনের সেই কথাটা নিয়ে একদিন তর্ক হয়েছিল—'কখনও ভাল না বাসার চেয়ে, ভালবেসে ভালবাসার পাত্রকে যদি হারাতে হয় সেও ভাল' *—তখন ঠিক স্বীকার করিনি, কিন্তু এখন সেই কথাটাকে একটা মহাসত্য বলে মেনে নিয়েছি।

আর আজ আমি যে তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, তা'তেও তোমার কোন হাত নেই। তোমার যা' সাধ্য তা' ত তুমি আমাকে দিতে প্রস্তুত—আমিই সেটাতে সন্তুষ্ট হ'বনা বলেই

* "'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all."
Tennyson's *In Memoriam.*

যাচ্ছি—তা'তে তোমার দোষ কি? তুমি একটু ভেবে দেখ্‌লেই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। তোমার সুবুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস অটল আছে—তবু তোমাকে আমার শেষ অনুরোধ—তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যা'বার কোনো চেষ্টা কোরো না। গ্রহের ফেরে যে ভুল হয়ে গেছে, সেটাকে আরও বড় করে তুলে শুধু নিজেদের কষ্ট পাওয়া আর সেই সঙ্গে আর পাঁচজনকেও কষ্ট দেওয়া বৈত নয়?

মাকে পিসিমাকে আমার প্রণাম, দিদিকে আর হেমাঙ্গিনীকে আমার ভালবাসা জানিও। তোরঙ্গর মধ্যে আমার গয়নার বাক্স আছে; সেটা এখন তোমার কাছে গচ্ছিত রইল—তাতে যা কিছু আছে সে গুলোয় আমার আর দরকার হবে না। সনতের বিয়ের সময় সেই গুলি দিয়ে বউমাকে আশীর্ব্বাদ কোরো—বাছাকে আজ সকালে শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি।

তোমার

জ্যোৎস্না।"

সেই পত্রখানি হস্তে লইয়া অজয় কিয়ৎকাল নৈরাশ্যের পাষাণ-মূর্ত্তির মত সেখানে বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্না যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিয়াছে সেই অভিমানে ব্যথিত হইয়া, অজয় প্রথমে আপানার বিরহ-দুঃখকেই বৃহৎ করিয়া তুলিল। ক্ষণকাল পরেই জ্যোৎস্নার স্নেহমমতা-যত্নের ক্ষুদ্র বৃহৎ শত নিদর্শন একে একে তাহার মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোৎস্নার

ভালবাসার গভীরতা স্মরণ করাইয়া দিল ; জ্যোৎস্নার দুরদৃষ্টের চিন্তায় তাহার নিজের মর্ম্মবেদনা খর্ব্ব হইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে জ্যোৎস্নার ত্যাগের মহিমা উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া উঠিল। অজয় বুঝিতে পারিল, যে তাহারই সংসার-স্বাচ্ছন্দ্যের হোমানলে জ্যোৎস্না তাহার ইহজীবনের সকল সুখ আহুতি দিয়া গিয়াছে ; যে কঠিন সমস্যা মীমাংসা করিতে অপারগ হইয়া অজয় পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আকুল ব্যাকুল—অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, জ্যোৎস্না আত্মত্যাগে সেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে—জ্যোৎস্না নিজের বক্ষ পাতিয়া সেই সেতুতে অজয়কে জীবন-পথের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশঙ্কট পার করিয়া দিয়া গিয়াছে—কিন্তু জ্যোৎস্না আজ কোথায়! অজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সে ত পৃথক্ পথে যাইতেছিল—প্রশস্ত ও কুসুমাস্তীর্ণ না হইলেও সেই স্ব-নির্ব্বাচিত নূতন পথে সে ত স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল। সহসা ভাগ্য-কুহকের নিষ্ঠুর ছায়াবাজিতে সমুৎপন্ন পিককুহরিত বর্ণে—গন্ধে—আমোদিত বাসন্তীকুঞ্জের মরীচিকায় ভুলিয়া সে কেন তাহার সুপরিচিত পথ ছাড়িয়া—দূরে—বহুদূরে অজয়ের অজানিত-মরু-পথে আসিয়া পড়িল? অজয় যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইল—জ্যোৎস্নার সেই কুসুমিত বাসন্তীকুঞ্জ দাবদগ্ধ—অজয়ের দুর্গম জীবন-পথ সুগম করিয়া দিয়া জ্যোৎস্না নিজে আজ দুস্তর মরু-প্রান্তরে—পথহারা!

সমাপ্ত

শ্রী[illegible]

(১) **শান্তি** (গার্হস্থ্য উপন্যাস)—সিল্কের মলাট, মূল্য ১৲।

"নবকৃষ্ণবাবু সুলেখক; পুস্তকখানি তাঁহার লেখনীর যোগ্য হইয়াছে। আমরা উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—(অর্ঘ্য "লেখকের রচনা-কৌশল সুন্দর।"—(হিতবাদী)

"An excellent book depicting with a masterly pen, a striking aspect of a Bengalee family."—*Indian Empire.*

"যাঁহারা বলেন, স্ত্রীস্বাধীনতা, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার এতদ্দেশে প্রচলিত না থাকায় ভাল উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে না, তাঁহারা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিলেই তাঁহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে।"—(দর্শক)

"Interesting and instructive"—*A. B. Patrika.*

"পড়িতে আরম্ভ করিলে ইহা শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ইহার রুচি মার্জ্জিত। ছোট বড় সকলের হাতেই এ গ্রন্থ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রদান করা যায়।"—(বাঙ্গালী)

(২) **তর্পণ**—শতাধিক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর জীবন-গাথা ও চিত্র।

"এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে"—(স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

"এরূপ নিরপেক্ষ গ্রন্থ এদেশে আর প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। * * পুস্তকখানিতে যে অসাধারণ কবিত্ব ফুটিয়াছে তাহাও তুলনা রহিত। তাহার লেখনীতে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।"—(নব্যভারত)

"বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ স্মারক কবিতা বড়ই বিরল। তর্পণকার প্রকৃতই এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন।"—(মহামনস্বী রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর) "অসাধারণ গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল, ভাবপূর্ণ ও প্রতিভার দ্যোতক।"—(হিতবাদী)

"পুস্তকখানি পাঠ করিলে হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে; মন উন্নত হয়। এক একখণ্ড 'তর্পণ' প্রত্যেকেরই রাখা উচিত।"—(অর্ঘ্য)। মূল্য ৸৹।